

মালক

কলেজ বার্ষিকী ২০২২



যশোরঞ্জি আ'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল



মালদ্বৰ

কলেজ বার্ষিকী ২০২২



যুবরাজীয় আ'দত কলেজ

করতিয়া, টাঙ্গাইল



মালপঞ্চ

প্রকাশকাল

২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক

সরকারি সাংদত কলেজ

করটিয়া, টাঙ্গাইল

প্রধান প্রষ্ঠপোষক

প্রফেসর সুব্রত নন্দী

অধ্যক্ষ, সরকারি সাংদত কলেজ

সম্পাদক

প্রফেসর ড. তাহমিনা খান

ইতিহাস বিভাগ

সদস্য

মো. হেলাল উদ্দিন

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

ড. আরমান হোসাইন আজম

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মো. সাইফুল ইসলাম

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

প্রচন্দ

বিনয় কৃষ্ণ দে

অলঙ্করণ ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা

লুকুক কম্পিউটার গেটওয়ে, টাঙ্গাইল

মোবাইল : ০১৬২৩-৫৫৮৫৯৫



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মৌলবি ওয়াজেদ আলী খান পল্লী (চাঁদ মিয়া)

আটিয়া পরগনার স্বামধন্য জমিদার

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা

‘বঙ্গের আলীগড়’ খ্যাত সান্দত কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা

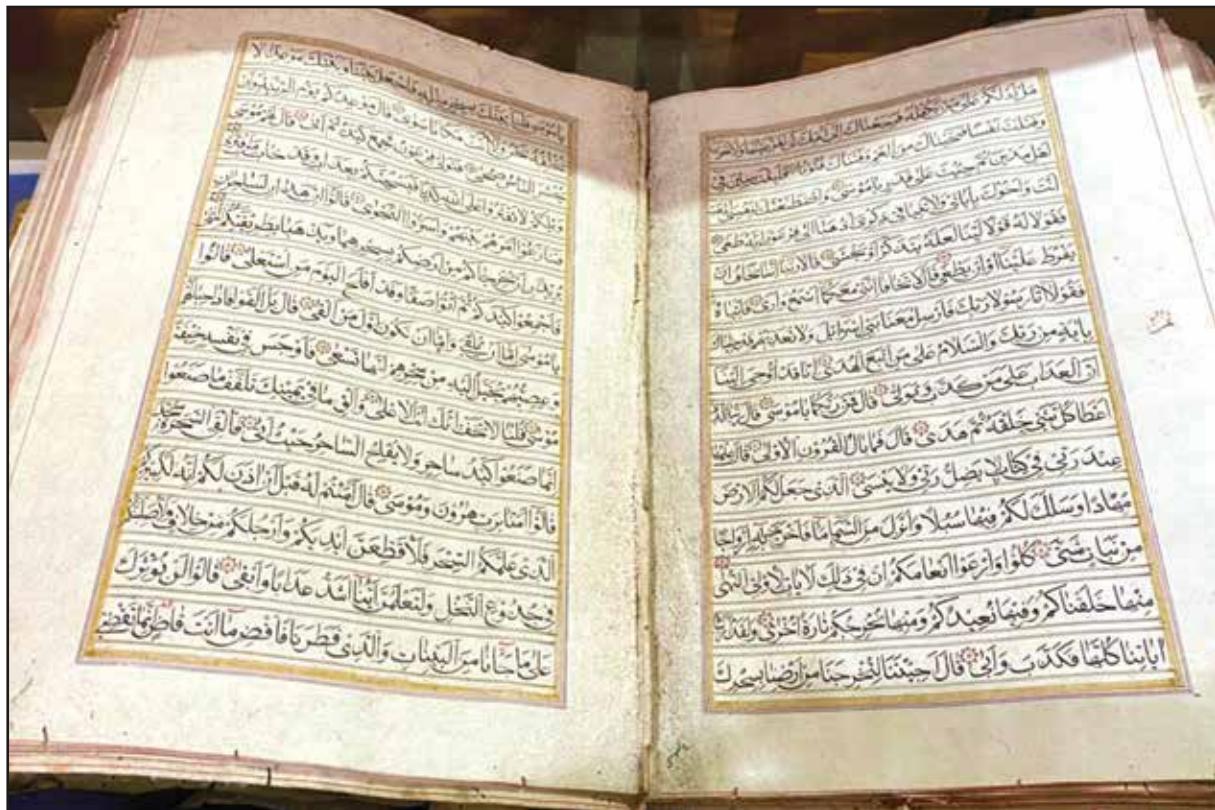


প্রিসিপাল ইবরাহীম খাঁ

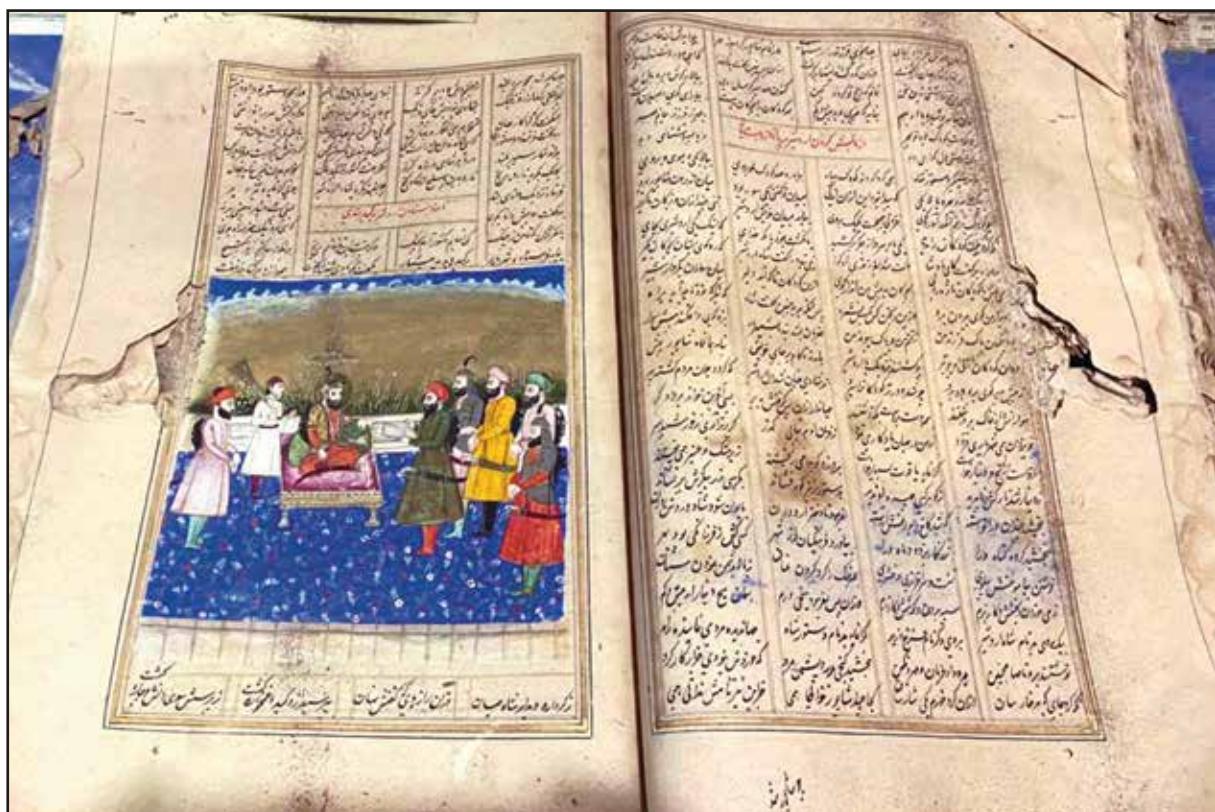
প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ

সরকারি সান্দত কলেজ

করাটিয়া, টাঙ্গাইল



কলেজ গ্রাহণারে সংরক্ষিত হাতে লেখা পবিত্র কোরআন মজিদ



কলেজ গ্রাহণারে সংরক্ষিত হাতে লেখা শাহনামা



বেগম ফজিলাতুন্নেসা

খুলনার আহসান উল্লাহর পুত্র জোহার পরিচয় হয়। পরে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বেগম ফজিলাতুন্নেসা লঙ্ঘন থেকে ফিরে ১৯৩০ সালে প্রথমে কলকাতায় স্কুল ইসপেক্টরের চাকরিতে যোগ দেন। ফজিলাতুন্নেসা ১৯৩৫ সালে কলকাতার বেথুন কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। বেথুন কলেজে চাকরিত অবস্থায় দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ১৯৪৮ সালে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এর আগে কোনো মুসলিম নারী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনি তাই তাঁকে বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম নারী অধ্যক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৫২ সালে ইডেন কলেজের মেয়েরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে মিছিলের যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার সঙ্গে তিনি সম্পত্তি ছিলেন। বেগম ফজিলাতুন্নেসা নারী অধিকার এবং স্বাধীনতায় সোচ্চার ছিলেন। নারীশিক্ষা ও নারীমূক্তি সম্পর্কে তিনি অসংখ্য নিবন্ধ-প্রবন্ধ ও গল্প লিখেছেন, যা তখন সওগাত ও শিখাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।



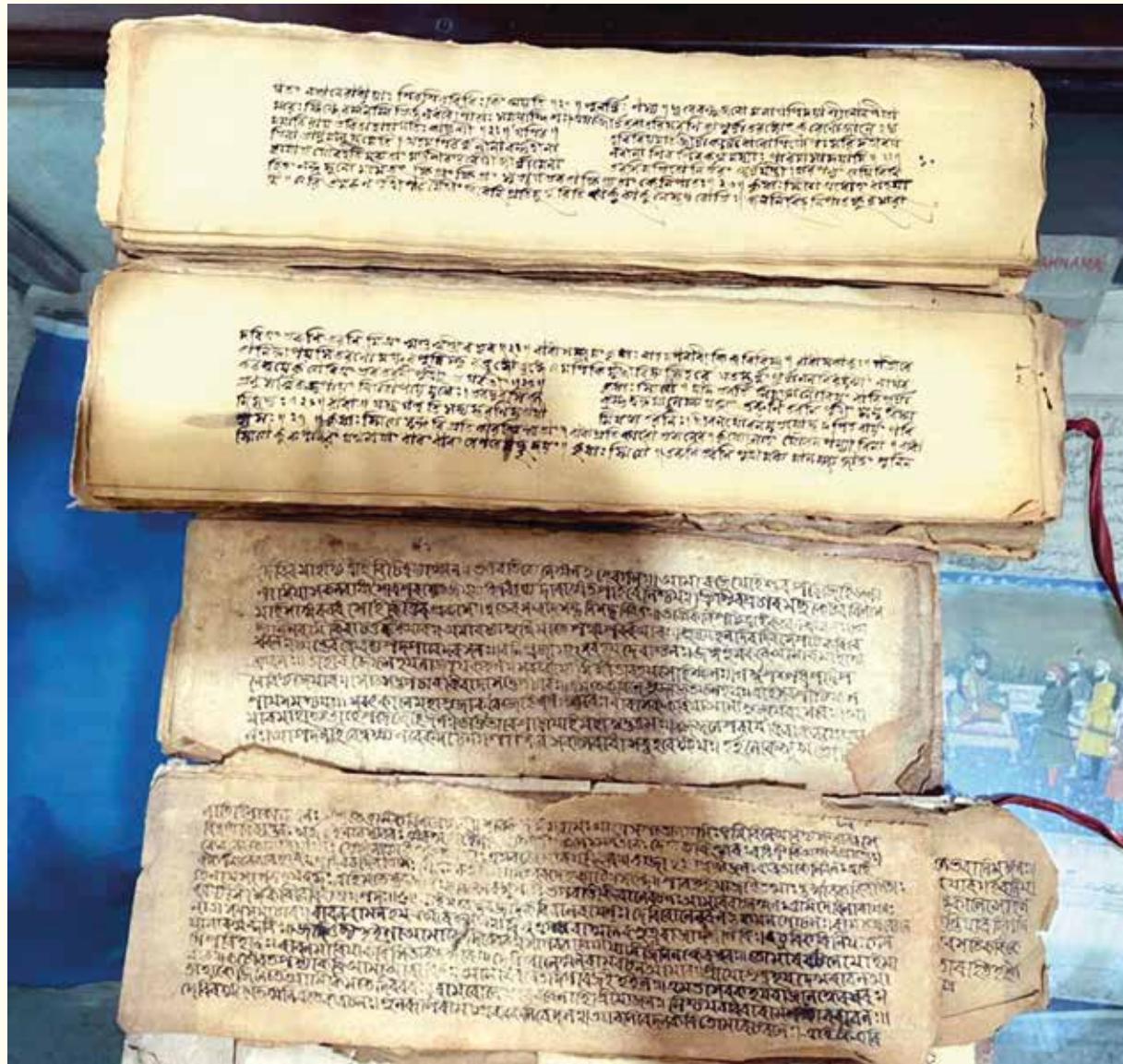
১৯২৮ সালে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয় ঘটে। তখন তিনি তাঁর গুণে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে নিয়ে 'বর্ষা-বিদায়' নামক একটি কবিতা লেখেন। পরে কবিতাটির নাম হয় 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ।'

ফজিলাতুন্নেসা'র নামে স্মৃতি রক্ষার্থে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭ সালে ছাত্রীদের জন্য একটি হল নির্মাণ করা হয় এবং সরকারি সাংবিধিক কলেজেও তাঁর নামে একটি ছাত্রী হোস্টেল রয়েছে।

এই বিদুষী নারী ১৯৭৭ সালে ২১ অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেসা জোহা নিখিল বঙ্গের প্রথম মুসলিম নারী গ্রাজুয়েট, বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম নারী অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী এবং উচ্চ শিক্ষার্থী বৃত্তি নিয়ে প্রথম বিদেশ যাওয়া বাঙালি মুসলমান ছাত্রী। তিনি টাঙ্গাইল সদর থানার নামদার কুমুলী গ্রামে ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়াজেদ আলী খাঁ, মাতা হালিমা খাতুন। তাঁর পিতা মাইনর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তবে এর আগে তিনি করোটিয়ার জমিদার বাড়িতে চাকরি করতেন। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় মেয়ের ভালো ফলাফল দেখে তিনি পারিবারিক অঞ্চলতা আর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁকে শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। ছয় বছর বয়সে ওয়াজেদ আলী খাঁ ফজিলতুন্নেসাকে করটিয়ার প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেন।

বেগম ফজিলাতুন্নেসা ১৯২১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও ১৯২৩ সালে প্রথম বিভাগে ইডেন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। তিনি ১৯২৫ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে ১৯২৭ সালে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (গোল্ড মেডালিস্ট) হয়ে এমএ ডিপ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯২৮ সালে বৃত্তি নিয়ে লঙ্ঘনে যান উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য। উপমহাদেশে মুসলিম নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ছ্রেট বৃটেন থেকে ডিপ্রি অর্জন করেন। তাঁর পড়াশোনায় করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খাঁ পক্ষী (চাঁদ মিয়া) বিশেষ উৎসাহ প্রদান ও অর্থ সাহায্য করেন। বিদেশে পড়ার সময়ে বেগম ফজিলতুন্নেসা'র সংগে



কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হাতের লেখা পাঞ্চলিপির ছবি

সাঁদত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

স্থাপিত : ১৯২৬ সাল

প্রতিষ্ঠাতা : আটিয়ার চাঁদ দানবীর জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্থী

অধ্যক্ষ সারণি সরকারিকরণের পূর্বে

ক্রম	নাম	কার্যকাল
০১	জনাব ইবরাহীম খাঁ (প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ)	১৯২৬-১৯৪৭
০২	জনাব এ. এফ. এম. সাইদ	১৯৪৮-১৯৪৯
০৩	জনাব তোফারেল আহমদ	১৯৫০-১৯৬৬
০৪	জনাব সামছুল আলম	১৯৬৮-১৯৭২
০৫	জনাব আলী আহমদ রশদী	১৯৭২-১৯৭৬
০৬	জনাব গোলাম উদ্দিন আহমেদ	১৯৭৬-১৯৭৭

সরকারিকরণের পরে

ক্রম	নাম	কার্যকাল
০৭	প্রফেসর এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম	১০.০৫.১৯৮০-১৫.১২.১৯৮০
০৮	ড. এম. সিরাজুল ইসলাম	১০.০৭.১৯৮২-১৭.০৫.১৯৮৩
০৯	প্রফেসর মো. খোদা বখ্শ মিয়া	২০.১১.১৯৮৩-৩০.১০.১৯৮৪
১০	ড. কে. এম. সেকান্দার আলী	৩০.১০.১৯৮৪-২৯০৬.১৯৮৫
১১	প্রফেসর লুতফুল হায়দার চৌধুরী	০৯.০২.১৯৮৬-০৫.০২.১৯৮৭
১২	প্রফেসর নাজির উদ্দিন আহমদ	১৬.০৯.১৯৮৭-০২.০১.১৯৮৯
১৩	প্রফেসর মো. আসাদুজ্জামান	০২.০১.১৯৮৯-১০.০৩.১৯৯২
১৪	প্রফেসর তাহের উদ্দিন আহমেদ	২০.০৪.১৯৯২-২০.০৭.১৯৯৬
১৫	প্রফেসর মো. আব্দুর রশীদ নেগাবান	০১.১২.১৯৯৬-২৬.১০.১৯৯৮
১৬	প্রফেসর মো. নাজিম উদ্দিন	২৫.০১.১৯৯৯-১৩.১১.১৯৯৯
১৭	প্রফেসর আবু মুহাম্মদ শফি-উজ-জামান	০৮.০৮.২০০০-১৮.১০.২০০০
১৮	প্রফেসর মো. সুলতান মিএও	১৪.০২.২০০১-২৬.১১.২০০১
১৯	প্রফেসর মো. রাশিদুল হাসান	১৬.০৪.২০০০২-০২.১২.২০০২
২০	প্রফেসর মো. রবকত আলী	০৯.১২.২০০২-২২.০১.২০০৪
২১	প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত)	২২.০১.২০০৪-১৭.০২.২০০৪
২২	ড. মো. নূরুল আমিন খান (মাহবুব সাদিক)	১৮.০২.২০০৪-৩০.১২.২০০৪
২৩	প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত)	৩১.১২.২০০৪-১৮.০১-২০০৫
২৪	প্রফেসর মো. সুলতান মিএও	১৯.০১.২০০৫-০১.০১.২০০৬
২৫	প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত)	০২.০১.২০০৬-২২.১২.২০০৬
২৬	প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান	২২.০৩.২০০৬-২৪.১২.২০০৬
২৭	প্রফেসর মো. সামসুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২৪.১২.২০০৬-০৫.০২.২০০৭
২৮	প্রফেসর মো. সামসুল হক	০৬.০২.২০০৭-৩১.০১.২০০৯
২৯	প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	৩১.০১.২০০৯-০৫.০২.২০০৯
৩০	প্রফেসর মো. আবু সাইদ	০৫.০২.২০০৯-১৫.০১.২০১১
৩১	প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	১৬.০১.২০১১-১৮.০৫-২০১১
৩২	প্রফেসর মো. সেলিম খান	১৮.০৫.২০১১-২৪.০৫.২০১১
৩৩	প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম	২৪.০৫.২০১১-২৯.০৯.২০১৪
৩৪	প্রফেসর মো. আনছার আলী (ভারপ্রাপ্ত)	২৯.০৯.২০১৪-৩১.০৩.২০১৫
৩৫	প্রফেসর মো. আফসার আলী	৩১.০৩.২০১৫-২৪.০৩.২০১৬
৩৬	প্রফেসর আফরোজা খানম	১৪.০৩.২০১৬-০২.০৫.২০১৬
৩৭	প্রফেসর মো. রেজাউল করিম (ভারপ্রাপ্ত)	০২.০৫.২০১৬-৩০.০৬.২০১৬
৩৮	প্রফেসর মো. রেজাউল করিম	৩০.০৬.২০১৬-১২.০৪.২০১৮
৩৯	প্রফেসর মো. আ. আলীম মিয়া (আলীম মাহমুদ) (ভারপ্রাপ্ত)	১২.০৪.২০১৮-০৪.০৭.২০১৮
৪০	প্রফেসর ড. আ. ফ. ম. শফিকুর রহমান	০৫.০৭.২০১৮-২৬.১২.২০১৮
৪১	প্রফেসর মো. আ. আলীম মিয়া (আলীম মাহমুদ)	২৬.১২.২০১৮-০১.০১.২০২২
৪২	প্রফেসর মৃদুল চন্দ্র পোদ্দার (ভারপ্রাপ্ত)	০১.০১.২০২২-১৩.০৩.২০২২
৪৩	প্রফেসর সুব্রত নন্দী	১৩.০৩.২০২২-

সাঁদত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

স্থাপিত : ১৯২৬ সাল

প্রতিষ্ঠাতা : আটিয়ার চাঁদ দানবীর জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্থী

উপাধ্যক্ষ সারণি সরকারিকরণের পূর্বে

ক্রম	নাম	কার্যকাল
০১	জনাব খন্দকার মোহাম্মদ হোসেন	১৯৬৫-১৯৭৬

সরকারিকরণের পরে

ক্রম	নাম	কার্যকাল
০২	ড. মোহাম্মদ আলী	২২.০৫.১৯৮০-১৯৮১
০৩	জনাব আব্দুল কুদ্দুস	১৯৮১-১৯৮৩
০৪	ড.এ. কে. এম সেকান্দার আলী	০৬.০৫.১৯৮৪-২৬.০১.১৯৮৫
০৫	ড. এ. কে. এম মোতামিনুর রশিদ	১৭.০২.১৯৮৬-১৯৮৭
০৬	জনাব মো. সোহরাব উদ্দিন মিয়া	২৫.০২.১৯৮৭-১৯৮৯
০৭	প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল হাসান	১৯৮৯-০২.০৯.১৯৯৩
০৮	প্রফেসর খন্দকার মোবারক আলী	২৮.১০.১৯৯৩-০১.০২.১৯৯৪
০৯	প্রফেসর আফরোজা বেগম	৩০.০৫.১৯৯৪-১৪.০২.১৯৯৫
১০	প্রফেসর মো. হাসানুল আলম	১৬.০৩.১৯৯৫-০১.০৭.১৯৯৮
১১	প্রফেসর মো. বেলায়েত হোসেন	০১.০৭.১৯৯৮-৩০.১২.১৯৯৯
১২	জনাব তপন কুমান বর্ধন	২২.০৪.২০০০-২৮.০৩.২০০১
১৩	জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান	২৮.০৩.২০০১-২১.০৪.২০০১
১৪	প্রফেসর ফিরোজা খানম	২১.০৪.২০০১-১১.০৬.২০০১
১৫	প্রফেসর সেতারা বেগম	০১.০৯.২০০১-০৭.১০.২০০১
১৬	প্রফেসর মো. বরকত আলী	০৮.১০.২০০২-০৯.১২.২০০২
১৭	প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান	১৫.০১.২০০৩-২২.০৩.২০০৬
১৮	প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক	২২.০৫.২০০৬-০৬.০২.২০০৭
১৯	প্রফেসর মো. আজিজুল হক	০৬.০৩.২০০৭-১৯.০৩.২০০৮
২০	প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম	২৫.০৮.২০০৮-২৫.০৫.২০১১
২১	প্রফেসর মো. আনছার আলী	১৭.০৭.২০১১-৩১.০৩.২০১৫
২২	প্রফেসর মো. রেজাউল করিম	০৯.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৬
২৩	প্রফেসর মো. আ. আলীম মিয়া (আলীম মাহমুদ)	২৬-০৯.২০১৬-২৬.১২.২০১৮
২৪	প্রফেসর মো. শহীদুজ্জামান মিয়া	২৭.১২.২০১৮-৩০.০৫.২০১৯
২৫	প্রফেসর মৃদুল চন্দ্র পোদ্দার	৩০.০৫.২০১৯-১০.০৮.২০২২

শিক্ষক পরিষদ
সরকারি সাংদৰ্শক কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

কার্যকরী পরিষদ সারণি

ক্রম	নাম	বিভাগ	পদবী	মেয়াদ
০১	আফ ম খলিলুর রহমান	বিভাগীয় প্রধান, বাংলা	সম্পাদক	১৯৭২-১৯৭৩
	মো. তোফাজ্জল হোসেন	অধ্যাপক, বাংলা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৭২-১৯৭৩
০২	মো. ওয়াজেদ আলী খান	বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস	সম্পাদক	১৯৭৪-১৯৭৫
	মো. সোহরাব উদ্দিন হাসান	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৭৪-১৯৭৫
০৩	মির্জা মোঃ আব্দুল মোমেন	বিভাগীয় প্রধান, অর্থনৈতি	সম্পাদক	১৯৭৬-১৯৭৭
	মো. আব্দুল মজিদ	অধ্যাপক, বাংলা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৭৬-১৯৭৭
০৪	মো. আব্দুল জলিল	বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা	সম্পাদক	১৯৭৭-১৯৮০
	মো. হারেসুল ইসলাম	প্রভাষক, অর্থনৈতি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৭৭-১৯৮০
	শ্রী ফরিদুর মোহন সাহা	প্রদর্শক, রসায়ন	কোষাধ্যক্ষ	১৯৭৭-১৯৮১
০৫	মির্জা মো. আব্দুল মোমেন	বিভাগীয় প্রধান, অর্থনৈতি	সম্পাদক	১৯৮০-১৯৮১
	শ্রী তপন কুমার বর্ধন	প্রভাষক, ইংরেজি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৮০-১৯৮১
০৬	মোকসেদ আলী খান	বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	সম্পাদক	১৯৮১-১৯৮২
	মো. আব্দুল জলিল	বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৮১-১৯৮২
	শাহ আশৰাফ আলী	প্রদর্শক, রসায়ন	কোষাধ্যক্ষ	১৯৮১-১৯৮২
০৭	মো. আব্দুল জলিল	বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা	সম্পাদক (ভারপ্রাণ)	১৯৮৩-১৯৮৪
০৮	মো. আখতার হোসেন	বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা	সম্পাদক	১৯৮৫-১৯৮৬
	মো. শাহজাহান মিয়া	প্রভাষক, ইংরেজি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৮৫-১৯৮৬
০৯	মো. শাহজাহান মিয়া	প্রভাষক, ইংরেজি	ভারপ্রাণ সম্পাদক	১৯৮৬-১৯৮৭
	শাহ আশৰাফ আলী	প্রদর্শক, রসায়ন	কোষাধ্যক্ষ	১৯৮৬-১৯৮৭
	আব্দুর রউফ	বিভাগীয় প্রধান, হিসাববিজ্ঞান	সম্পাদক	১৯৮৮-১৯৮৯
১০	মির্জা মো. আব্দুল মোমেন	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনৈতি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৮৮-১৯৮৯
	খন্দকার মদতু-ই-ইলাহী	এঞ্চারিক, কলেজ এঞ্চাগার	কোষাধ্যক্ষ	১৯৮৮-১৯৮৯
	শ্রী রঞ্জিত কাত সরকার	সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	সম্পাদক	১৯৯০-১৯৯১
১১	মো. সেলিম খান	প্রভাষক, অর্থনৈতি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯০-১৯৯১
	খন্দকার মদতু-ই-ইলাহী	এঞ্চারিক, কলেজ এঞ্চাগার	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯০-১৯৯১
	মো. নওয়ার আলী	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা	সম্পাদক	১৯৯২-১৯৯৩
১২	মুহাম্মদ শামসুল হক	প্রভাষক, বাংলা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯২-১৯৯৩
	আ. লতিফ মিয়া	প্রদর্শক, উচ্চদিবিদ্যা	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯২-১৯৯৩
	মো. ওয়াজেদ আলী খান	সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস	সম্পাদক	১৯৯৩-১৯৯৪
১৩	কবির আহমেদ পাটোয়ারী	প্রভাষক, ইস. ইতি. ও সংস্কৃতি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯৩-১৯৯৪
	খন্দকার মদতু-ই-ইলাহী	এঞ্চারিক, কলেজ এঞ্চাগার	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯৩-১৯৯৪
	মো. নওয়ার আলী	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা	সম্পাদক	১৯৯৪-১৯৯৫
১৪	মো. সেলিম খান	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনৈতি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯৪-১৯৯৫
	মো. ছানুয়ার হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯৪-১৯৯৫
	মো. ওয়াজেদ আলী খান	সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস	সম্পাদক	১৯৯৫-১৯৯৬
১৫	আব্দুল গফুর মোল্লা	প্রভাষক, ইংরেজি	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯৫-১৯৯৬
	মাইন উদ্দিন আহমেদ	সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯৫-১৯৯৬
	মো. সেলিম খান	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনৈতি	সম্পাদক	১৯৯৬-১৯৯৭
১৬	মো. শাহ আলম	প্রভাষক, গণিত	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯৬-১৯৯৭
	মাইন উদ্দিন আহমেদ	সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯৬-১৯৯৭
	মো. ওয়াজেদ আলী খান	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা	সম্পাদক	১৯৯৮-১৯৯৯
১৭	মো. ছানুয়ার হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯৮-১৯৯৯
	খন্দকার মদতু-ই-ইলাহী	এঞ্চারিক, কলেজ এঞ্চাগার	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯৮-১৯৯৯
	তপন কুমার বর্ধন	সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি	সম্পাদক	১৯৯৯-২০০০
১৮	মো. ছানুয়ার হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	১৯৯৯-২০০০
	খন্দকার মদতু-ই-ইলাহী	এঞ্চারিক, কলেজ এঞ্চাগার	কোষাধ্যক্ষ	১৯৯৯-২০০০
	মো. ছানুয়ার হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	সম্পাদক (ভারপ্রাণ)	১৯৯৯-২০০০
১৯	খন্দকার মদতু-ই-ইলাহী	এঞ্চারিক, কলেজ এঞ্চাগার	কোষাধ্যক্ষ	২২.০৪.২০০০
	মো. আলতাফ হোসাইন	প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা	প্যানেল অব সেক্রেটারি	
	মো. শানুয়ার হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	প্যানেল অব সেক্রেটারি	
২০	তাহমিনা খান	সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস	প্যানেল অব সেক্রেটারি	
	মো. শাহ আলী	সহকারী অধ্যাপক, গণিত	প্যানেল অব সেক্রেটারি	

ক্রম	নাম	বিভাগ	পদবী	মেয়াদ
২১	মো. আলতাফ হোসেইন	সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি	সম্পাদক	০১.০৭.২০০০
	মো. শাহ আলম	সহকারী অধ্যাপক, গণিত	যুগ্ম সম্পাদক	০১.০৭.২০০০
	মো. ছানুয়ার হোসেন	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	০১.০৭.২০০০
২২	আব্দুর রাহিম খান	সহকারী অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ	সম্পাদক	১৭.০৮.২০০৫
	মো. নজরুল ইসলাম	প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	যুগ্ম সম্পাদক	১৭.০৮.২০০৫
	সৈয়দ মোঃ শফিফ ইস্পাহানী	প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা	যুগ্ম সম্পাদক	১৭.০৮.২০০৫
২৩	মো. পোপাল হোসেন দেওয়ান	প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	সম্পাদক	০৩.৮.২০০৫
২৪	মো. রফিকুল ইসলাম	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সম্পাদক	০৫.৫.২০০৫
	মো. বেগলাল হোসেন	সহকারী অধ্যাপক, উচ্চদিবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	০৫.৫.২০০৫
	সাদেক আহমেদ খান	প্রভাষক, ইতিহাস	কোষাধ্যক্ষ	০৫.৫.২০০৫
২৫	মো. আব্দুর রশিদ খান	সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	সম্পাদক	২০০৯-২০১০
	মো. ছানুয়ার হোসেন	সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা	যুগ্ম সম্পাদক	২০০৯-২০১০
	রিপল মিএও	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা	কোষাধ্যক্ষ	২০০৯-২০১০
২৬	মো. মনিরজ্জামান মিয়া	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি	সম্পাদক	২০১০-২০১১
	এস এম চুলায়মান কবীর	সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস	যুগ্ম সম্পাদক	২০১০-২০১১
	লিটল কাস্তি হালদার	প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	কোষাধ্যক্ষ	২০১০-২০১১
২৭	মো. ওসমান ভূজ্যা	সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	সম্পাদক	২২.৬.১১-২২.১০.১১
	মো. আমিনুল ইসলাম	প্রভাষক, গণিত	যুগ্ম সম্পাদক	২০১১-২০১২
	মো. শহিদুজ্জামান	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	কোষাধ্যক্ষ	২০১১-২০১২
২৮	মো. আমিনুল ইসলাম	প্রভাষক, গণিত	সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)	২৩.১০.১১-২০.১১.১১
২৯	মো. আঃ আলীম মিয়া (আলীম মাহমুদ)	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সম্পাদক	২০১১-২০১২
	মো. আমিনুল ইসলাম	প্রভাষক, গণিত	যুগ্ম সম্পাদক	২০১১-২০১২
	মো. শহিদুজ্জামান	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	কোষাধ্যক্ষ	২০১১-২০১২
৩০	মো. আঃ আলীম মিয়া (আলীম মাহমুদ)	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সম্পাদক	২০১২-২০১৩
	মো. সাইফুল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	যুগ্ম সম্পাদক	২০১২-২০১৩
	আবু হায়দার মোহাম্মদ নূরে আলম	প্রভাষক, উচ্চদিবিদ্যা	কোষাধ্যক্ষ	২০১২-২০১৩
৩১	প্রফেসর এস এম ওয়াহেবুজ্জামান	বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	সম্পাদক	২০১৩-২০১৪
	মো. আজিজুর রহমান বাবলা	প্রভাষক, ইতিহাস	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৩-২০১৪
	মো. ওমর আলী	প্রভাষক, অর্থনীতি	কোষাধ্যক্ষ	২০১৩-২০১৪
৩২	মো. আজিজুর রহমান বাবলা	প্রভাষক, ইতিহাস	সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)	৫.৬.১৩-২৫.৯.১৩
৩৩	মো. মনিরজ্জামান মিয়া	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি	সম্পাদক	২০১৩-২০১৪
	মো. আজিজুর রহমান বাবলা	প্রভাষক, ইতিহাস	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৩-২০১৪
	মো. ওমর আলী	প্রভাষক, অর্থনীতি	কোষাধ্যক্ষ	২০১৩-২০১৪
৩৪	মো. নজরুল ইসলাম খান	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সম্পাদক	২০১৪-২০১৫
	মো. মোজাফিজুর রহমান	সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৪-২০১৫
	এস এম আবু সাইদ	প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	কোষাধ্যক্ষ	২০১৪-২০১৫
৩৫	মো. শহীদুজ্জামান মিয়া	সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	সম্পাদক	২০১৫-২০১৬
	মো. মোশারফ হোসেন	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৫-২০১৬
	আসলাম হোসেন	প্রভাষক, রসায়ন	কোষাধ্যক্ষ	২০১৫-২০১৬
৩৬	মো. শহীদুজ্জামান মিয়া	সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান	সম্পাদক	৩১.৫.১৬-২০.৬.১৬
	মো. মোজাফিজুর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৬-২০১৭
	আসলাম হোসেন	প্রভাষক, রসায়ন	কোষাধ্যক্ষ	২০১৬-২০১৭
৩৭	মো. মোজাফিজুর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.৬.১৬-৩১.৫.১৭
৩৮	মো. আসাদুজ্জামান	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সম্পাদক	২০১৭-২০১৮
	মো. মোজাফিজুর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৭-২০১৮
	মো. দেস্ত মাহমুদ	প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা	কোষাধ্যক্ষ	২০১৭-২০১৮
৩৯	মো. নজরুল ইসলাম খান	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	সম্পাদক	২০১৮-২০১৯
	মোহাম্মদ আবেদ আহাদ তালুকদার	সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৮-২০১৯
	মো. নাইমুল হাসান	প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা	কোষাধ্যক্ষ	২০১৮-২০১৯
৪০	প্রফেসর তাহমিনা খান	বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস	সম্পাদক	২০১৯-২০২১
	মো. ছেলায়মান হাসেন	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা	যুগ্ম সম্পাদক	২০১৯-২০২১
	আতিকুর রহমান	প্রভাষক, গণিত	কোষাধ্যক্ষ	২০১৯-২০২১
৪১	মো. মোশারফ হোসেন	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি	সম্পাদক	২০২১-২০২২
	মোহাম্মদ আকতার হোসেন	সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি	যুগ্ম সম্পাদক	২০২১-২০২২

কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সারণি

প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি : শামসুল হক

ক্রম	সহ-সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক	কার্যকাল
০১	কাজী নুরজামান	জগদীশ বসু	১৯৪৮-৪৯
০২	মো. নুরুল ইসলাম	যতীন সাহা	১৯৪৯-৫০
০৩	মো. নওসের আলী তালুকদার	বিজয় ঘোষ	১৯৫০-৫১
০৪	আবু সাঈদ	কানাই পাল	১৯৫১-৫২
০৫	আ. রশীদ খান	ভগিনী সুত্রধর	১৯৫২-৫৩
০৬	মো. হুমায়ুন খালিদ	নরেণ ঘোষ	১৯৫৩-৫৪
০৭	মো. হবিবর রহমান	নুরুল ইসলাম খান	১৯৫৪-৫৫
০৮	মো. জহরুল হক	আর.আই. জালালী	১৯৫৫-৫৬
০৯	মো. আমীর খসরু	মফিজুর রহমান সিদ্দিকী	১৯৫৬-৫৭
১০	আব্দুল জলিল	মো. সোহরাব আলী	১৯৫৭-৫৮
১১	মো. জালাল উদ্দিন আহমেদ	মো. গিয়াস উদ্দিন	১৯৫৮-৫৯
১২	মো. নওশের আলী	মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী	১৯৫৯-৬০
১৩	সৈয়দ মুরশেদ আলী	লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী (লক্ষ্মন নন্দী)	১৯৬০-৬১
১৪	জি.এস. আলম খান	মুস্তাফিজুর রহমান	১৯৬১-৬২
১৫	মো. ফজলুল করিম (মির্ঠু)	আজিজুল হামিদ খান	১৯৬২-৬৩
১৬	সৈয়দ সামচুল হোসেন	মেহের আলী	১৯৬৩-৬৪
১৭	শাহজাহান সিরাজ	আশফাকুর রহমান	১৯৬৪-৬৫
১৮	আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী	কাজী আতাউর রহমান	১৯৬৫-৬৬
১৯	শাহজাহান সিরাজ	মো. শামচুল আলম	১৯৬৬-৬৭
২০	খন্দকার আব্দুল বাতেন	সোহরাব আলী খান	১৯৬৮-৬৯
২১	মো. আজিজুর রহমান খান	মহির উদ্দিন মেহের	১৯৬৯-৭০
২২	মো. আবুল মনসুর	খন্দকার মকবুল হোসেন	১৯৭০-৭১
২৩	সৈয়দ মাজেদ হোসেন	জি. এস. সুলতান হক	১৯৭৩-৭৪
২৪	কামরুজ্জামান খান	মির্জা শামসুল আলম	১৯৭৯-৮০
২৫	এ.কে.এম. আনোয়ারুল ইসলাম	মো. আব্দুর রাজ্জাক মিয়া	১৯৮০-৮১
২৬	মো. জোয়াহেরুল ইসলাম	মো. জিনাহ্ মিয়া	১৯৮৬-৮৭
২৭	মো. আদনান আখতার	মো. জিনাহ্ মিয়া	১৯৮৭-৮৮
২৮	মো. জোয়াহেরুল ইসলাম	চিত্তরঞ্জন দাস নুপুর	১৯৮৭-৮৮
২৯	মো. মনিরুল ইসলাম মিন্টু	চিত্তরঞ্জন দাস নুপুর	১৯৮৯-৯০
৩০	শামীম আল মামুন সিদ্দিকী (আজাদ)	বদিউজ্জামান ফারুক	১৯৯১-৯২
৩১	সেলিম রেজা সেলিম	সৈয়দ আব্দুল মাল্লান বাবুল	১৯৯২-৯৩
৩২	হাসান ইয়াম খান সোহেল হাজারী	কামরুজ্জামান রিপন	১৯৯৬-৯৭
৩৩	সানিয়াত খান বাঙ্গা	নাজমুল হৃদা নবীন	২০১৪-১৫

কলেজ পরিচিতি

সরকারি সাঁদত কলেজ বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম কলেজ। এর বৃহত্তর পরিসর, ভৌত অবকাঠামো, সুবিধা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উচ্চশিক্ষায় অবদান ইত্যাদি নানা বিচারে বাংলাদেশের সরকারি কলেজসমূহের মধ্যে সরকারি সাঁদত কলেজ প্রথম সারির কলেজ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্তর, বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতির সঙ্গে সরকারি সাঁদত কলেজ নিরিডুভাবে জড়িত। এ কলেজের গৌরবন্দীপুঁতি ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে।

দেশের যে কয়টি বড় এবং বিখ্যাত কলেজের নাম সকলের মুখে প্রচারিত সেগুলোর মধ্যে সরকারি সাঁদত কলেজও অন্তর্ভুক্ত। সাঁদত কলেজ নিঃসন্দেহে একটি বড় কলেজ এবং বিখ্যাত কলেজ এর সমন্বয় ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের বিচারে।

‘বঙ্গের আলীগড়’ নামে খ্যাত এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামধন্য জমিদার, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বাঙালি মুসলিম নেতা মৌলবি ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া)। গৌড়ের সুলতান সোলায়মান কররানীর অধৃষ্টন পুরুষ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী জমিদার হিসেবে ছিলেন প্রজাবৎসল, শিক্ষানুরাগী, সমাজহিতৈষী ও স্বাধীনতাকামী। তিনি পিছিয়ে পড়া ধ্রামীণ জনসাধারণের উন্নতির প্রধান উপায় হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব উপলক্ষ করে কর্তৃত্বার মতো নিভৃতপন্থীতে তাঁর পিতামহ সাঁদত আলী খান পন্নী’র নামে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘সাঁদত কলেজ’ কর্তৃত্বাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে। সাঁদত কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান সহযোগী হিসেবে পান ইব্রাহীম খাঁ-কে, যিনি পরবর্তীকালে প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে দেশের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাঁদত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজটি এক অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৩৮ সালে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৬৬ সালে এ কলেজে অনার্স ও ১৯৭৪ সালে মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৯ সালে সাঁদত কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ মাতৃকোত্তর কলেজ। এখানে পাস কোর্স ছাড়াও ১৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং ১৫টি বিষয়ে মাস্টার্স (শেষ পর্ব) কোর্স চালু আছে। এসব কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার।



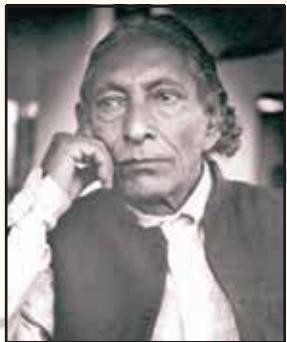
এক নজরে সরকারি সাঁদত কলেজ

প্রতিষ্ঠাতা : মৌলবি ওয়াজেদ আলী খান পন্থী (চান্দ মিয়া)

০১. স্থাপিত	: ১৯২৬ খ্রি:
০২. সরকারিকরণ	: ০৭/০৫/১৯৭৯ খ্রি:
০৩. জমির পরিমাণ	: প্রায় ৩৭.০৭ একর
০৪. কলেজ কোড	: ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত- ৭০ খ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত- ৫৩০১ গ) EIIN - 114747
০৫. অধ্যক্ষ	: ০১ জন
০৬. উপাধ্যক্ষ	: ০১ জন
০৭. অধ্যাপক	: ১১ জন
০৮. সহযোগী অধ্যাপক	: ৩০ জন
০৯. সহকারী অধ্যাপক	: ৩৯ জন
১০. প্রভাষক	: ৫১ জন
১১. প্রদর্শক	: ০৮ জন
১২. শরীরচর্চা শিক্ষক	: ০১ জন
১৩. লাইব্রেরিয়ান	: ০১ জন
১৪. সহ-লাইব্রেরিয়ান	: ০১ জন
১৫. একাডেমিক ভবন	: ০৩টি ক) প্রশাসনিক, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান ভবন (প্রবিসা) দ্বিতল ভবন- ০১টি খ) ব্যাবসায় শিক্ষা ভবন ০৫তলা- ০১টি গ) কলা ভবন ০৫তলা- ০১টি
১৬. প্রশাসনিক ভবন	: ০১টি
১৭. শ্রেণিকক্ষ	: ১৯টি
১৮. লাইব্রেরি ভবন	: ০১টি (দ্বিতল ভবন)
১৯. লাইব্রেরিতে বই সংখ্যা	: ২৮৩০০টি
২০. মসজিদ	: ০১টি
২১. অনার্স বিষয় সংখ্যা	: ১৮টি (বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ইসলামের ইতিহাস, ইসলাম শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, মার্কেটিং, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন)
২২. মাস্টার্স বিষয় সংখ্যা	: প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স ১ম পর্ব- ০৮টি (বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ কর্ম, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যাবস্থাপনা, প্রাণিবিদ্যা) মাস্টার্স শেষ পর্ব- ১৫টি (বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিতি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যাবস্থাপনা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিত)
২৩. মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	: প্রায় ২২ হাজার

২৪. পাঠদানকৃত শ্রেণি	:	ক) ডিগ্রি (পাস)- ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ (বি.এ, বি.এস.এস, বি.এসসি, বি. বি.এস) খ) অনার্স- ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ গ) মাস্টার্স ১ম পর্ব ও ঘ) মাস্টার্স শেষ পৰ
২৫. খেলার মাঠ	:	০১টি
২৬. মিলনায়তন	:	০১টি
২৭. শহীদ মিনার	:	০১টি
২৮. পুকুরের সংখ্যা	:	০২টি
২৯. সাধারণ কক্ষ (ছাত্র)	:	০১টি
৩০. সাধারণ কক্ষ (ছাত্রী)	:	০১টি
৩১. ছাত্র সংসদ কক্ষ	:	০১টি
৩২. শিক্ষক মিলনায়তন	:	০১টি
৩৩. গাড়ি সংখ্যা	:	০৬টি (০৫টি বাস ও ০১টি হাইস/ম্যাইক্রো)
৩৪. ৩য় শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা	:	১০জন (কর্মরত- ০৩জন)
৩৫. ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা	:	২৮ জন (কর্মরত- ১২জন)
৩৬. ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা (দিনমজুর)	:	৯৫ জন
৩৭. কম্পিউটার অপারেটর (দৈনিক ভিত্তিক)	:	২৩জন
৩৮. ছাত্রাবাস	:	০২টি (ক) ওয়াজেদ আলী খান পল্লী হল (খ) ইব্রাহীম খাঁ ছাত্রাবাস)
৩৯. ছাত্রীনিবাস	:	০১টি (ফজলাতুল্লেহা ছাত্রীনিবাস)
৪০. কম্পিউটার ল্যাব	:	০২টি (গণিত বিভাগ ও আইসিটি বিভাগ- CEDP-এর অর্থায়নে)
৪১. গবেষণাগার	:	০৪টি (পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, উক্তিদিবিজ্ঞান ও রসায়ন)
৪২. ফুলের বাগান	:	০৬টি
৪৩. ক্রীড়া বিভাগ	:	০১টি
৪৪. বিদ্যুৎ সাবস্টেশন	:	০১টি
৪৫. ডিপ-টিউবওয়েল	:	০১টি
৪৬. অধ্যক্ষের বাস ভবন	:	০১টি (১ তলা বিশিষ্ট ইম্প্রভাইজড)
৪৭. চিকিৎসা কেন্দ্র	:	০১টি
৪৮. সাব-পোস্ট অফিস	:	০১টি
৪৯. রোভার স্কাউট অফিস	:	০১টি
৫০. বি.এন.সি.সি অফিস	:	০১টি
৫১. বিশ্রামাগার (নজরুল কুটির)	:	০১টি
৫২. অনুষ্ঠান মঞ্চ	:	০১টি
৫৩. ভান্ডার কক্ষ	:	০১টি
৫৪. সহ-শিক্ষা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন	:	০৪টি (বি.এন.সি.সি, রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার, বাঁধন, রেড ক্রিসেট)
৫৫. সাংস্কৃতিক সংগঠন	:	০৩টি (ক) শিল্পলোক (খ) আবৃত্তি সংসদ (গ) ডিবেটিং ক্লাব
৫৬. ওয়েবসাইট	:	সংশোধন ০৮

সরকারি সা'দত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, যাঁরা দেশ-বিদেশে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত



বপুজি আলী মিয়া
(১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬ - ২৭ জুন ১৯৭৯)



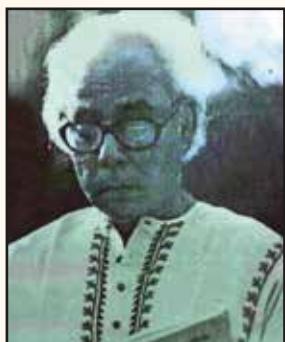
পি সি সরকার
(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ - ৬ জানুয়ারি ১৯৭১)



মোহাম্মদ আবদুল হক
(১ জানুয়ারি ১৯১৮ - ৬ এপ্রিল ১৯৯৬)



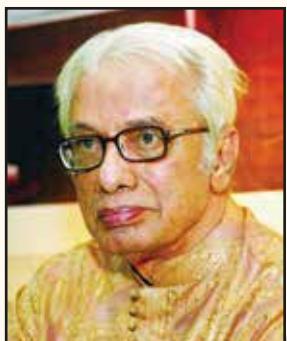
শামছুল হক
(১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ - ১৯৬৫)



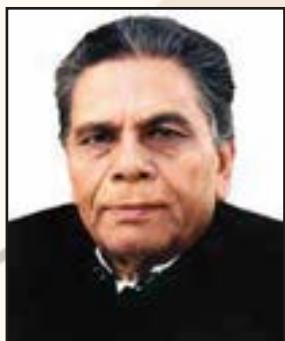
তালিম হোসেন
(২৯ অক্টোবর ১৯১৮ - ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)



মির্জা নূরুল হাদ্দা
(১ আগস্ট ১৯১৯ - ২২ ডিসেম্বর ১৯৯১)



ড. আশরাফ সিদ্দিকী
(১ মার্চ ১৯২৭ - ১৯ মার্চ ২০২০)



আব্দুল মান্নান
(৭ অক্টোবর ১৯২৯ - ৪ এপ্রিল ২০০৫)



শামসুর রহমান খান শাহজাহান
(২৫ জানুয়ারি ১৯৩৩ - ২ জানুয়ারি ২০১২)



মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল
(১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ - ৫ এপ্রিল ২০১৬)



প্রিম্পিপাল হুমায়ুন খালিল
(১ আগস্ট ১৯৩৫ - ২৯ ডিসেম্বর ২০০২)

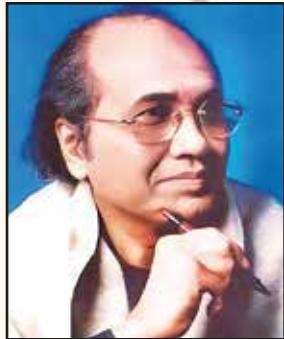


তারাপদ রায়
(১৭ নভেম্বর ১৯৩৬ - ২৫ আগস্ট ২০০৭)

সরকারি সা'দত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, যাঁরা দেশ-বিদেশে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত



লতিফ সিদ্দিকী
(১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭ -)



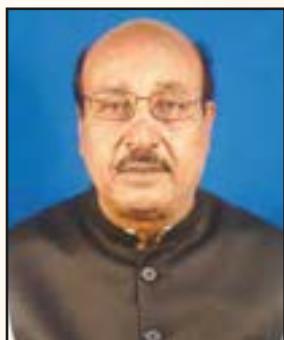
আল মুজাহিদী
(১ জানুয়ারি ১৯৪৩ -)



শাজাহান সিরাজ
(১ মার্চ ১৯৪৩ - ১৪ জুলাই ২০২০)



ফজলুর রহমান খান ফারুক
(১২ অক্টোবর ১৯৪৪ -)



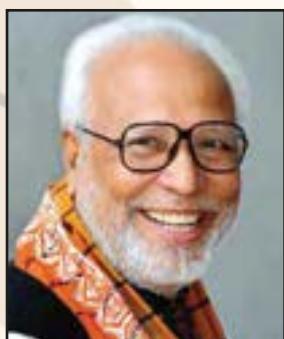
খন্দকার আবদুল বাতেন
(১৭ মে ১৯৪৬ - ২১ জানুয়ারি ২০১৯)



আ. ক. ম. মোজাফ্ফেল হক
(১ অক্টোবর ১৯৪৬ -)



সায়যাদুল কাদির
(১৪ এপ্রিল ১৯৪৭ - ৬ এপ্রিল ২০১৭)



কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম
(১৪ জুন ১৯৪৭ -)



ড. মাহবুব সাদিক
(২৫ অক্টোবর ১৯৪৭ -)



সেলিম আল দীন
(১৮ আগস্ট ১৯৪৯ - ১৪ জানুয়ারি ২০০৮)



জোয়াহেরুল ইসলাম
(১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ -)



আলীম মাহমুদ
(২ জানুয়ারি ১৯৬৩ -)





ড. দীপু মনি এম.পি.

শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি সাঁদত কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ পরিসরের বিদ্যাপীঠ। উচ্চশিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং গবেষণায় এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম সুবিদিত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা ও সাহিত্যমূলক বার্ষিক ম্যাগাজিন 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সরকারি সাঁদত কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীন ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই দেশ একদিন সোনার বাংলায় জুন্মাত্রিত হবে এটা ছিল তাঁর অন্তরের চাওয়া। এ জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। সরকারি সাঁদত কলেজ সে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ গঠনে সরকারি সাঁদত কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে তাঁদের অবদান রেখেছেন।

জাতির পিতার সুযোগ্য কল্যান বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বের কারণে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে দেশের সাক্ষরতার হার আজ শতকরা পঁচাতার ভাগ। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি করে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষায় বিশেষ সুবিধা প্রদান, প্রাইমারি থেকে পিইচডি পর্যন্ত দুই কোটির বেশি বৃত্তি চালু করা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভৃতি উন্নতি সাধন প্রভৃতি এই সরকারের সাফল্য। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'জনকল্প ২০৪১' বাস্তবায়ন সহজ হবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মিত হবে। এই লক্ষ্য পূরণে শিক্ষামন্ত্রণালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি নির্মাণে অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সততা, সাহস, দক্ষতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, মানবিকতা ও অক্ষত্রিম দেশপ্রেমের কারণে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, প্রযুক্তি, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সাহিত্যসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রভৃতি উন্নতি সাধন করেছে। এর ধারাবাহিকতা অঙ্গুল রাখতে দেশে শিক্ষিত, দক্ষ, সংস্কৃতিমনা ও মূল্যবোধসম্পন্ন জনশক্তির বিকল্প নেই। আমি বিশ্বাস করি সরকারি সাঁদত কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সে প্রত্যয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তার স্মারক হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ প্রকাশ তাদের বিশুদ্ধ প্রয়াস।

আমি সরকারি সাঁদত কলেজ থেকে প্রকাশিতব্য বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ'র সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং মালঞ্চ প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. দীপু মনি এম.পি.



মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.

উপমন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি সাঁদত কলেজ সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঘও প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সাহিত্য সাময়িকী কোনো কলেজের পড়ালেখা, নান্দনিক আচরণ, সংস্কৃতি, ও তার গুণগত মানকে নির্দেশ করে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, কৌড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতি ক্ষেত্রে সরকারি সাঁদত কলেজ তার সে মানকে সমৃদ্ধত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঘও তার একটি প্রয়াস। বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঘও প্রকাশের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ডিজিটাল আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। আর সে জন্য শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন অপরিহার্য। বর্তমান সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও বিশ্বমানের করে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের কলেজসমূহ সে মূল উদ্যোগের অংশীদার। এসব কলেজ হতে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভীষ্ট ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি সাঁদত কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে আমি সে আহ্বান জানাই।

করোনা মহামারি সারাবিশ্বের ষাট লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ছ্বিব করে দিয়েছে। সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ধীরস্তির সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত, দিকনির্দেশনা ও আর্জুতিক যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশ সফলভাবে করোনা মহামারিকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় গতিশীলতা ফিরে এসেছে। সরকার স্কুল পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের করোনা প্রতিরোধী টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এখন নির্বিচ্ছেদে ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছে। সরকারি সাঁদত কলেজ থেকে প্রকাশিতব্য মালঘও তার একটি উজ্জ্বল প্রয়াস।

সরকারি সাঁদত কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে কৌড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সাহিত্য সাময়িকী ও জার্নাল প্রকাশকে আমি সান্দেচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঘও'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এম.পি.



মোঃ ছানোয়ার হোসেন এম.পি.
১৩৪, টাঙ্গাইল-৫
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

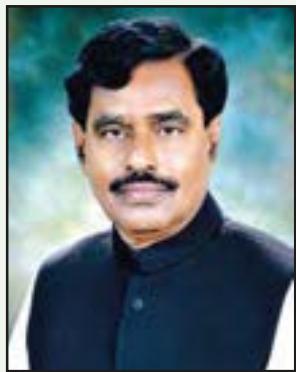
বঙ্গের আলীগড় খ্যাত সরকারি সাঁদত কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন মালয়েল প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সাহিত্য সাময়িকী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দর্পণস্বরূপ। এটা শিক্ষার্থীদের নান্দনিক আনন্দে উৎসাহিত করে। বার্ষিক ম্যাগাজিন মালয়েল প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সরকারি সাঁদত কলেজ আমার নির্বাচনী এলাকা টাঙ্গাইল-৫ এ অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আটিয়ার জিমিদার দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্থী (চাঁদ মিয়া) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমানে কলেজটিতে ডিপ্লি (পাস) সহ ১৮টি বিষয়ে হাতক (সম্মান), ১৫টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ৮টি বিষয়ে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স কোর্সে প্রায় বিশ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বর্তমান সরকারের আমলে ৫ তলাবিশিষ্ট একটি ছাত্র হোস্টেল, একটি ছাত্রী হোস্টেল ও সুবৃহৎ দুটি একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ সীমানাসহ অবকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এ কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চিরন্তন সূক্ষ্ম অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার নান্দনিক উপস্থাপনের জন্য ২০২২ সালে সরকারি সাঁদত কলেজের কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন মালয়েল প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

যাদের নিরন্তর পরিশ্রমে মালয়েল প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে সে প্রত্যাশা রাখি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ ছানোয়ার হোসেন এম.পি.



মোঃ জোয়াহেরুল ইসলাম এম.পি.
১৩৭, টাঙ্গাইল-৮
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বঙ্গের আলীগড়খ্যাত ঐতিহ্যবাহী সরকারি সাঁদত কলেজ টাঙ্গাইল জেলার আপামর জনসাধারণের প্রাণের স্পন্দন। বৃত্তিশিল্পী আন্দোলনসহ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্টি সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলের সঙ্গে এবং বাংলাদেশরাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে সরকারি সাঁদত কলেজের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই কলেজের প্রথম নির্বাচিত ডি.পি. ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। তারই ধারাবাহিকতায় কলেজ-ছাত্রসংসদের নির্বাচিত ডি.পি. হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। এ কলেজের যেকোনো ভালো সংবাদ আমাকে মুঝে করে। কলেজের অতীত ঐতিহ্য অনুসারে সাহিত্যবিষয়ক বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ ২০২২ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয়সহ 'মালঞ্চ' প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

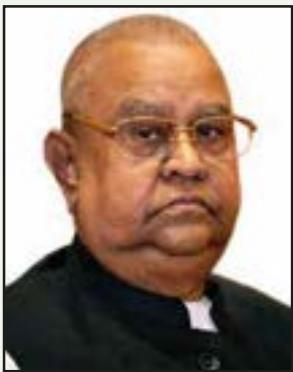
সরকারি সাঁদত কলেজে ছাত্র-সংসদের নেতৃত্ব দানকালে আমি কলেজের সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ, শিক্ষার শান্তি ও আনন্দমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে সকল শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও কলেজপ্রশাসনকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করেছি। আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগুরুত্বিক চর্চার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে। কবিতা, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, খেলাধূলাসহ সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের জন্য সকলের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ের সাহিত্যসাময়িকী মালঞ্চ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মননশীল সাহিত্যচর্চার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ।

সর্বকালের সর্বশেষ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার কোন বিকল্প নেই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি অসাম্প্রদায়িক চেতনা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ইতিবাচক কাজের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে সে চেতনার বিকাশ ঘটে। মাননীন প্রধানমন্ত্রী দেশেরত্ব শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে সম্মতি অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক সম্মতিকে আরও টেকসই করতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সহনশীলতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পাঠ এবং নিবিড় অনুশীলন অপরিহার্য। আমি বিশ্বাস করি কলেজ ম্যাগাজিন মালঞ্চ এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আমি সরকারি সাঁদত কলেজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করি। বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ প্রকাশনার সম্পাদনাপর্ষদসহ কলেজের অধ্যক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষা, কৌড়া ও সংস্কৃতির উৎকর্ম সাধনে সরকারি সাঁদত কলেজ তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে সে প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জোয়াহেরুল ইসলাম এম.পি.



একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা
ফজলুর রহমান খান ফারুক
সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ
চেয়ারম্যান, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ
সাবেক গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্য

বাণী

আটিয়া পৰগণৰ জমদানৰ পৰা পৰিবাবেৰ স্মতিবিজড়িত সৱকাৰি সাঁদত কলেজ টাঙ্গাইল জেলাৰ একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। প্ৰতিষ্ঠালগ্ন থকে
বালিদেশৰ ক্ৰিক্ৰা সামৰ্থ্য সংকৃত বিজ্ঞানৰ তথ্য সকল ক্ষেত্ৰে সৱকাৰি সাঁদত কলেজ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতীয় পালন কৰিবলৈ অসমৰে।
অসমৰ শিক্ষণ জানে-গুণে সন্মেৰ মাধ্যমে দেশ-দেশে অসমৰ অজন্ম কৰিবলৈ। এ কলেজেৰ মুহূৰ্তী সামৰ্থ্যক প্ৰক্ৰিয়া একটি
মহেশ্বৰ প্ৰয়াস। এ প্ৰচেষ্টাৰ বাবাৰ কৰিত বাবাৰ ম্যাজিজন মলশং ২০২২ প্ৰকাশৰে মুদোগাচাৰ আৰু বাবাৰ ম্যাজিজন। এটি কলেজৰ
মুক্তিথাদৰ নথনৰ কণ্ঠে দণ্ডনৰ বৰ্ণণ ও পৰিবৰ্তনৰ কৰিত পথকে সগম কৰিবলৈ কৃতিত্ব কৰিবলৈ।

ফজলুর রহমান খান ফারুক

Bernard L. Gruen



অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

বাণী

সরকারি সাঁদত কলেজ বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলা, মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিঠানটির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে সাঁদত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর হাত ধরে এই বিদ্যাপীঠ সাহিত্যচর্চায়ও অংশী স্থান করে নিয়েছে। দেশের অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের সূতিকাগার হিসেবে কাজ করে সাঁদত কলেজ। সাহিত্য-সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশ থাকার জন্যই নানা কৃতীসম্ভাবনার সাফল্যের ভিত্তিভূমি কর্তৃত্বাধীন এই কলেজ।

বার্ষিক ম্যাগাজিন 'মালঘৎ' প্রকাশ সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-সূত্রিকথাসহ মানবিক অনুভূতির নান্দনিক প্রকাশের জন্য সাহিত্য-শিল্পচর্চার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের নানা ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার সৌন্দর্যকেও এক সূত্রে গাঁথতে সাহিত্যের ভূমিকা অনন্বীক্ষণ। এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ধারণাটিকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য সাহিত্যচর্চার স্মারক হিসেবে 'মালঘৎ' আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সাঁদত কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।



অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান



অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ

বাণী

কলেজসমূহে শ্রেণিপাঠ কার্যক্রমের পাশাপাশি ম্যাগাজিন, জার্নাল, সাহিত্যপত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে, তাদের বিশুদ্ধ বিনোদন হয় এবং সাহিত্য ও গবেষণায় তাদের সানন্দ আগ্রহ তৈরি হয়। সরকারি সাঁদত কলেজ সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিশীলিত পরিবেশ তৈরি ও নান্দনিক পাঠ কার্যক্রমের জন্য সরকারি সাঁদত কলেজের এ ধরনের প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই।

১৯২৬ সালে আটিয়া পরগণার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্থী ঠাঁর পিতামহ সাঁদত আলী খান পন্থীর নামে কলেজটি তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে ইবরাহিম খাঁ ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রিসিপাল ইবরাহিম খাঁ বড়ো মাপের একজন সাহিত্যিক হিসেবে বাঙালি পাঠকজনের কাছে সুপরিচিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে টাঙ্গাইল তথা বাংলাদেশের শিক্ষা ও সাহিত্যে কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরকারি সাঁদত কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত তাংপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে শিক্ষা, সাহিত্য ও তৈড়ায় সরকারি সাঁদত কলেজ তার অবদানকে আরো দৃশ্যমান করবে আমি সে আহ্বান জানাই।

জাতির পিতার সুযোগ্য কল্যাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা একটি উন্নত টেকসই বাংলাদেশ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। করোনা মহামারিকে সুচারূপে মোকাবিলা করে একটি ছ্বিতশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় যে ইতিবাচক গতিশীলতা তৈরি হয়েছে আমরা সে ধারাকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারি সাঁদত কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষা ধারার একটি বড়ো অংশ। আমি বিশ্বাস করি সরকারি সাঁদত কলেজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প উন্নত বাংলাদেশ গঠনে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কলেজ বার্ষিকী মালঞ্চ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সরকারি সাঁদত কলেজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। একই সঙ্গে আমি আশা করি শিক্ষা, সাহিত্য ও সংকৃতির উৎকর্ষ সাথনে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে তার বিভিন্ন সূজনশীল ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ



অধ্যাপক সুব্রত নন্দী
অধ্যক্ষ
সরকারি সাংদত কলেজ

বাণী

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষর বহন করে সরকারি সাংদত কলেজ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজস্ব ঐতিহ্যের গুণে এ কলেজের সুনাম দেশ ও দেশের বাইরে সর্বজন সুবিদিত। আমরা এ কলেজের পৃষ্ঠপোষক প্রজাহিতৈরী জিমিদার দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পাল্লীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে সশ্রান্তিচিত্তে স্মরণ করছি জ্ঞানতাপস প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁকে, যিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের বিকাশে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অনুগ্রাহীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। সরকারি সাংদত কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রাণের স্পন্দন বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ তার ধারাবাহিক রূপ। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ছাত্রনেতৃবৃন্দসহ সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক সুরী সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারি সাংদত কলেজ পরিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সে প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বৈশিষ্ট্য মহামারী করোনা মোকাবিলা করে দেশে শিক্ষার শাস্তিপূর্ণ সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাশ, পরীক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চলছে। আমরা সরকারি সাংদত কলেজ সে সুফলের অংশীদার। এখানে নিয়মিত পরীক্ষা ও পাঠকার্যক্রমের পাশাপাশি সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিএনসিসি, রোভার, এবং সেবামূলক সংগঠন বাধন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার সবক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে কলেজে নান্দনিক পরিবেশ বিরাজ করছে। সৃজনশীল বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ হলো তার আনন্দঘন কার্যক্রমের অংশ বিশেষ।

সরকারি সাংদত কলেজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ কলেজ। প্রতিবছর এখান থেকে অগণিত শিক্ষার্থী সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা লাভ করে দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। এ কলেজের অনেকে শিক্ষা-সাহিত্য ও জাদুবিদ্যায় বিরল প্রতিভাবরসহ রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ খেতাবপ্রাপ্তও রয়েছেন। বহু শিক্ষার্থী তাদের পেশাগত জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। জাতীয় সংসদসহ সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৃজনশীলতায় তারা আরো সমৃদ্ধ হবে। আমরা সরকারি সাংদত কলেজকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।

যাঁদের লেখায় এই ম্যাগাজিনটি সমৃদ্ধ হয়েছে আমি তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক ও সম্পাদনা পর্যবেক্ষণ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, যাঁদের অক্রান্ত পরিশ্রম ও মেধার সমন্বিত ফসল এই প্রকাশনা। শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা জাতি গঠনে সরকারি সাংদত কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঞ্চ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বিত এই সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম নিয়মিত অব্যাহত থাকবে সে প্রত্যয় ব্যক্ত করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক সুব্রত নন্দী



মো. মোশারফ হোসেন
সম্পাদক
শিক্ষক পরিষদ
সরকারি সাঁদত কলেজ

বাণী

বাংলাদেশের সরকারি কলেজসমূহের মধ্যে সরকারি সাঁদত কলেজ একটি অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী কলেজ। নিয়মিত পাঠকার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি সাঁদত কলেজ সহশিক্ষা কার্যক্রমেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ কলেজের শিক্ষার্থীরা গ্রীড়া ও সংস্কৃতি জগতে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যসাময়িকী, জার্নাল ও বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ। তার ধারাবাহিকতায় বার্ষিক ম্যাগাজিন মালঝ ২০২২ প্রকাশ কলেজের স্থিতিশীল সুন্দর পরিবেশের পরিচয় প্রকাশ করে। এটি আমাদের কলেজের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়। কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয়সহ মালঝ প্রকাশনার সম্পাদক, সম্পাদনাপর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলেজের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দরকারি তথ্য, কলেজের অতীত ও বর্তমানের ক্রিয়া-কর্ম ও গৌরবগাঁথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কলেজসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক লেখকদের নান্দনিক সাহিত্যকর্মসহ সবকিছু মিলে মালঝ হয়ে উঠেছে কলেজের দর্পণ। মালঝ যেন সৃজনশীল মানসিকতার পুষ্পালোকিত এক মিলনমেলা। একটি বিদ্যাপীঠে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রিক চালিত বিদ্যায়তনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের হৃদয়াবেগিক অনুভূতির চমৎকার প্রকাশ ঘটে সাহিত্য ও শিল্পকলায়। এক হৃদয়ের অনুভূতি সঞ্চারিত হয় অন্য হৃদয়ে। এই সঞ্চরণের মাধ্যম হিসেবে এবং বিদ্যার্থীদেরকে আরও উৎসাহিত করার জন্য মালঝ'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্মিতির আনন্দে জীবন হয়ে উঠুক আরও খন্দ। আগামীতেও মালঝ প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক এবং আরও সৃজনশীল হয়ে উঠুক কলেজের সকল সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরূপ। কলেজের নান্দনিক পরিবেশ সকলকে মুক্ত করুক আমি সেই কামনা করি। সকলকে আবারো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মো. মোশারফ হোসেন



অধ্যাপক ড. তাহমিনা খান
সম্পাদক
‘মালঞ্চ’ প্রকাশনা কমিটি
সরকারি সাংদত কলেজ

সম্পাদকীয়

শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতির ঐতিহ্য একইসাথে ধারণ করে টাঙ্গাইল জেলা। আর সেই ঐতিহ্যের অন্যতম কর্ণধার সরকারি সাংদত কলেজ। আমরা কৃতজ্ঞ দানবীর প্রজাহিতৈষী জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর প্রতি, যাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে সংগীরবে টাঙ্গাইল জেলাকে সুপরিচিতি দান করে চলেছে দেশব্যাপী। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি দ্বনামে খ্যাত জ্ঞানতাপস অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে, যিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি এমনভাবে গড়েছিলেন যে, কোনো প্রতিকূলতাই এর অঘ্যাতায় যতিচহু আঁকতে পারেনি; সময়ের দাবিতে সে অনড়। সগর্বে উচ্চারণ করছি- প্রতিষ্ঠানের এই বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসেবেই প্রকাশিত হলো কলেজের ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিত কলেজবার্ষিকী মালঞ্চ।

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”- এই স্লোগানের সারথি আমরা।

মালঞ্চ প্রকাশনায় আন্তরিক অনুপ্রেরণা, নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন বর্তমান সুযোগ্য অধ্যাপক সুব্রত নন্দী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রীসহ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সুচিত্তি ও জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত করেছেন।

সাহিত্য সংস্কৃতির দর্পণ, যার চর্চা মানুষের মননশীলতা ও মূল্যবোধকে শাগিত করে প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথকে সুগম করে, কাজেই শিক্ষার্থীর জন্য সাহিত্যচর্চা অপরিহার্যই বলা যায়। সেক্ষেত্রে মালঞ্চ প্রকাশনায় আলোকবর্তিকা হয়ে শিক্ষার্থীদের থাপিত করেছেন শিক্ষক পরিষদসহ আমার বিজ্ঞ সহকর্মীবৃন্দ। তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কলেজের শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশহাঙ্গ এই প্রকাশনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মালঞ্চ প্রকাশে অহঙ্কাৰী ভূমিকা রেখে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে ছাত্রনেতৃবৃন্দ। তাদের জন্য অভিনন্দন।

পাঠ্যশিক্ষাকার্যক্রমের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কলেজবার্ষিকীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনন্বীক্ষ্য হলেও কাজটি দুরহ ও কষ্টসাধ্য। সেক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে আমার সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দের শ্রম, নিষ্ঠা ও সর্বাত্মক চেষ্টার ফল এই প্রকাশনা, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই গুরুদায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে আমাকে ঝোপী করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সবাইকে, যারা মালঞ্চ প্রকাশে উৎসাহ প্রদানসহ সহযোগিতা করেছেন।

মালঞ্চ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনার জন্য আন্তরিক আহ্বান রইল। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আমরা প্রত্যেকেই আন্তরিকভাবে উদ্যোগী।

অধ্যাপক ড. তাহমিনা খান
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ

সূচিপত্র

সৃতিকথা

সৃতির দর্পণে অমলিন	৩৫
ও প্রফেসর ফওজিয়া বানু	
রাগ ও ডিপ্রাইভ	৩৭
ও মো. সরোয়ার উদ্দিন	
রড়োডেন্ড্রন আর ম্যাগনেলিয়ার দেশে	৩৮
ও হিমাংশু মোহন পাল	
জ্ঞান বিকাশে সাঁদত কলেজ	৪৩
ও মো. আবদুছ ছাত্রার	
আবার সিলেট	৪৪
ও মিনারক্ল ইসলাম	
নাটোরের বিখ্যাত ছিন ভ্যালি	৪৬
ও মো. মুসফিকুর রহমান লিয়ন	
সৃতিকথা	৪৭
ও আব্দুর রহমান	

প্রবন্ধ

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান	৫০
ও অধ্যাপক শায়লা ইয়াছমিন	
সৃতির পাতায় প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ	৫২
ও ড. মো. আশোকুল হাসান	
বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল মডেলিং ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	৫৫
ও আহমদ এহসান উল হান্নান	
সাঁদত আলী খান পল্লী উনিশ শতকের এক খ্যাতিমান জমিদার	৫৮
ও শুলায়মান কবীর	
মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবন্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে	৬১
ও মো. মোশারফ হোসেন	
পল্লী পরিবারের যাঁদের নামে করটিয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬৪
ও মো. হোলায়মান হোসেন	
কালের আর্বতে সংখ্যা	৬৬
ও মো. মুক্তার হোসাইন	
সুষম খাদ্য সুষ্ঠু জাতি গঠনে সহায়ক	৬৮
ও সানজিদা আক্তার কেয়া	
প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র 'বাতায়ন'	৭১
ও শামস উদ্দিন চয়ন	
মহানায়কের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৭৩
ও মো. হান্নান মিয়া	
একুশ শতকের গ্রামীণ শিক্ষা	৭৭
ও মোঃ আফজাল হোসাইন	

কবিতা

৭৯-১০১

গল্প

স্বপ্নের বাবু	১০৩
ও মোঃ আজিজুর রহমান (বিপ্লবী বাবলা)	
প্রণয়	১০৫
ও ফাহিমা আক্তার	
অভিযান	১০৬
ও শিপন আলম	
হৈমন্তীর সাথে একদিন	১১১
ও উমর ফারুক	
বৃক্ষবন্ধু	১১২
ও লক্ষ্মী দত্ত	
অন্যরকম	১১৩
ও নাজরুল হাসান	
শেষ ঠিকানা	১১৪
ও সজিব মিয়া	
ভয়	১১৬
ও সুমাইয়া রহমান সৰ্বা	
পোড়া হাড়	১১৮
ও সানজিদা মেহের নাহিদা	
অপেক্ষা	১১৯
ও সিমা খান সুখি	
অপেক্ষা	১২১
ও মো. ফরহাদ হোসেন	



ମୁଦ୍ରକବାଟ



স্মৃতির দর্পণে অমলিন প্রফেসর ফজলিয়া বানু

বাবার চাকরিসূত্রে জন্ম থেকেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দা। নীলক্ষেত্র মোড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার একদম রাস্তা সংলগ্ন চারতলা ভবনটির চতুর্থতলাতেই আমার জন্ম। ভবনটির উল্টোদিকে তখন নীলক্ষেত্র ফাঁড়ি ছিল। পশ্চিম দিকের কাঁচাবন রাস্তাটি ছিল একটি রেললাইন। রেললাইনের দুপাশেই বাস্তি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে আমরা এ ভবনেই ছিলাম। অনেক পরিবার ‘হয়তো কিছু হতে পারে’ আঁচ করতে পেরে ঢাকা শহর ত্যাগ করেছিল। আবাকেও বলেছিল। আমরা চার ভাই বোন বেশ ছোট। আম্মা সন্তানসম্ভবা। অফিসও খোলা। কি মনে করে বাবা মো. হাবিবুল্লাহ শহর ত্যাগ করেননি। সেদিন গভীর রাতে আমার মা জানালা দিয়ে দেখেন অনেকগুলো মিলিটারির গাড়ি ফাঁড়ির সামনে ভিড় করে আছে। আম্মা আবাকে ঘুম থেকে উঠতে বলেন। আবু বুবতে পারেন কিছু একটা হতে যাচ্ছে। সাথে সাথেই পাশের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। আগুনের লেলিহান শিখা প্রায় আমাদের জানালার পর্দায় লেগে যায় এমন অবস্থা। ঘুমত অসহায় মানুষের আতঙ্কিকারে চারদিকে ভীতিকর পরিস্থিতি। ঘরটিতে দিনের আলোর মতো আলোকিত বিছানায় আমরা চার ভাই-বোন ঘুমিয়েছিলাম। আবু আমাদের টেনে নিচে নামিয়ে হামাঞ্জড়ি দিয়ে পাশের ঘরে মাটিতে শুইয়ে দেন। তখন বলাকা সিনেমা হল এর উপর থেকে মাইকে বলা হচ্ছে, জয়বাংলা পতাকা নামিয়ে ফেলো। বারান্দায় জয়বাংলা পতাকা ছিলো। দিশেহারা বাবা পতাকা নামাতে গেলেন। সাথে সাথেই তার কানের দুইপাশ দিয়ে দুটো গুলি সিলিংয়ের অনেকটা ভেঙে দিয়ে বারান্দায় ছিটকে পড়লো। আবুর কানে তারপর থেকে সমস্যা হয়। আবু নিচু হয়ে ঘরে এসে আমাদের নিয়ে চুপ করে পড়ে রইল আর দোয়া দরদ পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ। হানাদার বাহিনী ছাদে গেলো। নিচে নামল। আমাদের বাসার বাইরে যাওয়ার দুটো দরজা। একটাতে বাইরে থেকে তালা লাগানো ছিল। আল্লাহতালার অশেষ রহমতে ওরা দরজা ভাঙেনি বা বুবতে পারেনি ভিতরে মানুষ আছে। না হলে সেই রাতের অপারেশন সার্চলাইটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হানাদার বাহিনী যে নারকীয়



হত্যাকাণ্ড চালায় সেখানে আমাদেরও বেঁচে থাকার কথা ছিল না। সেই রাতে পাশের বিল্ডিং এর ছাদে উঠে দুইজনকে এবং এলাকার অন্যান্য বাসায় কিছু লোকে হানাদার বাহিনী হত্যা করে।

এই ঘটনাগুলো আমার মনে থাকার কথা নয়। হয়তো সবসময় শুনতে শুনতে নিজের স্মৃতিতে একটি স্থায়ী ছাপ পড়ে গেছে। বহুদিন বারান্দার সিলিংয়ের এসব গুলির ক্ষতিগ্রস্তগুলি ছিল। গুলির পিতলের কভারগুলোও আমি দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের কথা লিখে তো শেষ করা যাবে না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে। তাকে ২৫শে মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিবারকেও বন্দি করে রাখা হয়। দীর্ঘ নয়টি মাস যুদ্ধ চলে। ৩০ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্মের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতার লাল সূর্য দেখতে পাই।

যুদ্ধ শেষে যথারীতি স্কুলে যেতে থাকি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল। একদিন একটি মিষ্টি লাজুক হাসির ছেলে ক্লাসে আসে। সে নতুন ভর্তি হয়। জানলাম সে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল। কিছুদিনের মধ্যেই তার সাথে সবার ভাব হয়ে যায়। দুর্স্ত ছিল রাসেল, বেশ হাসিখুশি ছিলো। মাথাভর্তি তার রেশমের মতো চুল। দেশের প্রেসিডেন্টের ছেলে বলে তাকে আলাদা কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে শিক্ষককে দেখিনি। তবে তাকে যথাযথভাবে পড়াশোনা করার জন্য বেশ খেয়াল রাখতেন শিক্ষকবৃন্দ। আমাদের একজন সহপাঠী ওয়াহিদা (বর্তমান কানাড়া প্রবাসী) শেখ রাসেলকে টিফিন পিরিয়ডে অংক করতে সাহায্য করতো। আমি পাশে বসে থাকতাম। সে সময় বাংলা বইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর একটি লেখা ছিলো। একটা পাতায় তাঁর বড় ছবি ছিলো, আমি প্রায়ই রাসেলকে ছবিটি দেখিয়ে বলতাম, ইনি কে রাসেল? সে চুপ করে থাকতো, কোন কথা বলত না। আমাদের গানের ক্লাস হতো। গান শিখাতে আপা আসলেই রাসেল দাঁড়িয়ে বায়না ধরত “আমার সোনার বাংলা” আর “তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই” গানটি গাইবার। ম্যাডাম বলতেন, “নতুন গান শিখিয়ে তারপর ঐ গান গাইবো”। কখনো এ দুটি গান না গাইলে রাসেলের মুখটি ভার হয়ে যেত। স্কুল ছুটির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ কামাল ছোট ভাইকে নিতে আসতেন। অন্য সকল অভিভাবকদের সাথে শেখ হাসিনা করিডোরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। প্রেসিডেন্ট তনয়া হিসেবে তাকে আলাদা কোনো খাতির করতে কাউকে দেখিনি। তরণ শেখ কামালকে দেখেছি হোস্তা নিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষা করতে। শেখ রাসেলের ফুফাতো ভাই-বোনেরাও (আব্দুর বব সেরনিয়াবাতের সন্তান) এই স্কুলে পড়তেন।

আমার মামা জনাব শামসুল হক (কালিয়াকৈর) বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক স্তোর্য ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রথম যে মন্ত্রিসভা গঠন হয় তিনি সেখানে সমবায় মন্ত্রী ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দুই বাসায় আমাদের যাতায়াত ছিলো। মামার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান হয় ইঙ্কাটন লেডিস ক্লাবে। সেখানে বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন। সেদিন আমি কতগুলো শিশুর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বঙ্গবন্ধু আমিসহ কংজন শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বেশ লস্বা-চওড়া একজন মানুষ। হাসিখুশি মুখ। আর একদিন তাকে দেখলাম শহিদ মিনারে বেদীতে ফুল দেওয়ার পর যখন আমি, আমার ভাই, আবা আর তাজউদ্দীন আহমদ হেঁটে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর গাড়ি পাশ দিয়ে যাচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি হাত নাড়লেন। মনে হলো যেন খুব কাছের একজন মানুষ। প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের খুব আপন একজন মানুষ।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। নানা রকম আয়োজন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে আগমন করলে শেখ রাসেল প্রেসিডেন্টকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করবে এমন একটি সুন্দর পরিকল্পনা ছিল। ১৪ আগস্ট দুপুরে অরোরে বৃষ্টি শুরু হলো। আবা একটি গাড়ি নিয়ে আমাদের স্কুল থেকে আনতে গেলেন। কতটুকু আর পথ। নীলক্ষেত্র মোড়েই বাসা। হঠাৎ দেখি সামনের জিপে শেখ রাসেল। তার গাড়ি আমাদের আগে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে আমাদের বাসার পাশেই শারীমদের বাসায়। জিপের পেছনটা খোলা, শেখ রাসেল আর শারীম গাড়ির প্রাণ্টে দাঁড়ানো। রাসেল হাত দিয়ে বৃষ্টির পানির ধারা ধরছে, আর এত হাসছে! সে হাসিটা এখনো মনে আছে। কে জানতো পরদিন এ সময়ে সে সেই হাসি আর হাসতে পারবে না।

পরদিন ভোরবেলা আমরা স্কুলে যাবার জন্য রেডি হচ্ছিলাম। আবা সকালেই চলে গেছেন অফিসে। তিনি অভ্যর্থনা কর্মসূচিতে ছিলেন। কেন যেন আমি বাসার বারান্দায় এসে নিচে তাকালাম। দেখি আবা বেশ জোরে হেঁটে বাসায় চলে আসছেন। আবা হাতে লাল ফিতা ও কাঁচি। আস্মা বললেন, চলে আসলেন যে? ওদের নিয়ে যাবেন না? আবা বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে, রেডিও খুলো তাড়াতাড়ি। রেডিওতে মর্মান্তিক সংবাদটা শুনলাম। তারপর এক মাস স্কুল বন্ধ ছিল। স্কুল খোলার পর আমরা নৌরবে রাসেলকে মনে করতাম। পনেরো আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার কংদিন আগে তার বড় ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিয়ে হয়। সে বেশ কংদিন স্কুলে আসেনি। যেদিন সে এলো, তখন তার মাথা একদম লাল রঙে রঙিন ছিল। শুনেছি সবশেষে তাকে হত্যা করা হয়। ছোট শিশুর সামনে একে একে সবাইকে হত্যা করা হয়। আতঙ্কিত ভীত শেখ রাসেল বলেছিল ‘আমি মার কাছে যাব’ হায়েনারা তাকে ছাড়েনি। শেষপর্যন্ত হত্যা করেই তাকে তার মা'র কাছে পাঠিয়ে দেয়। কতটা কষ্ট ও যন্ত্রণা নিয়ে শিশু রাসেল মারা গিয়েছিল!

তার রক্তের ঝঁঁ ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের রক্তের ঝঁঁ কি শোধ হবার?

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিদিয়া বিভাগ, সরকারি সার্দিত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল



রাগ ও ডিপ্রাইভ

মো. সরোয়ার উদ্দিন

রাগ, অনুরাগ, অনুনয় বা কোনোরকম ভাব ধরে কোনো উপকার পাওয়া যায় না। রাগকে নিয়ন্ত্রণ করুন। নিয়ন্ত্রণ হলো— প্রথমে স্বাভাবিক ভাষায় বুঝিয়ে বলুন। বুঝার চেষ্টা না করলে ধর্মক দিন। এতেও কোনো কাজ না হলে, সাঁড়শি দিয়ে খুব শক্ত করে চেপে ধরুন।

ডিপ্রাইভ-এর অর্থ এও যে, ‘সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা।’ হয়তো মা-বাবা ঠিকমতো বুঝাতে পারেনি সন্তানকে। তাই সন্তান ডিপ্রেইভড। অরণ রাখবেন— এ পৃথিবীতে মা-বাবার মতো আপনজন আর কেউ নেই। বিধায়, আর আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করে রেখ না মা-বাবাকে।

সমাজে অধিকাংশ অপরাধ, অন্যায় ও অপকর্ম পুরুষরাই করে থাকে। এজন্যে অনেক নারীকে আজীবন কঠিন যন্ত্রণার বোৰা বহন করতে হয়। এ দুঃসময়ে কেউই এগিয়ে আসে না এতটুকু সাহায্যের জন্যে। এমনকি অতি আপনজনও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সবার প্রিয় হয়রত মুহাম্মদ (সা.) সবসময় থাকতেন শোষিত, বধিত ও দুখি মানুষের কাতারে। ইসলামকে যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও অনুসরণ করেন, তারা কখনোই কি হয়রত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শকে অবজ্ঞা করতে পারে?

এক সময় টেনশন ও কষ্টের পালা শেষ হয়। শুরু হয় মহান সৃষ্টিকর্তার অনাবিল শান্তির ধারা।





রড়োডেন্ড্রন আর ম্যাগনোলিয়ার দেশে হিমাংশু মোহন পাল

ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহনের বাসটি যখন শিলিঙ্গড়ি পৌছল, স্র্য তখন মধ্যাকাশে মধ্যাচ্ছেত্রের তীব্রতা জানান দিচ্ছিল। জংশন রোডের বাস স্টেশনে বহুমুখী মানুষের ভিড় আর ঘর্মাক্ত তনুর সুতীর্ব ‘মোহময়’ আবেশ দ্রুত স্থানত্যাগের তাড়া দেবে। শৈষ্ঠ দুপুরের আহার সমাপনাত্তে জনপ্রতি ১৫০/- রুপি হারে ভাড়া মিটিয়ে গন্তব্য সোজা দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্য; আমরা ০৯ জন, একটা টাটা সুমোতে। শিলিঙ্গড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে প্রথমেই চোখে পড়বে দু'পাশে সমতল চা বাগান। আন্তে আন্তে উঁচু পাহাড় দৃশ্যমান। উঁচু থেকে এক সময় সুউচ্চ। গরম উবে গিয়েছে। হালকা ঠাণ্ডা। একপশলা বৃষ্টি ঠাণ্ডানুভবের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগণ। পথিমধ্যে যাত্রাবিরতিতে দার্জিলিং চায়ের সঙ্গে চাওয়িনের যে এক মিশেল বন্ধন তৈরি করেছিল তাহী রমণী, তার রেশ অত সহজে কাটবার নয়। যাত্রাপথ অন্যান্য পাহাড়ী পথ থেকে ভিন্ন নয়। অপ্রশংস্ত, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, সর্পিল, উঁচু-নিচু। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তা ধরে সাঁই করে চলছে সুমো। সাড়ে তিন ঘণ্টায় দার্জিলিং, শিলিঙ্গড়ি থেকে ৬২ কি.মি.।

তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। দার্জিলিংয়ে সুউচ্চ পাহাড়ী রেল স্টেশনের কাছে লাডেন লে রোডে আবাসন ১৬০০ রুপি প্রতি কক্ষ, হোটেল গারণ্দা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা!

দার্জিলিং শহরটা কেমন যেন নিশ্চার নয়! সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাতটা একদম শূন্য, নিঃস্তুর।

রাতেই হোটেল ম্যানেজার বাবুর সহায়তায় গাড়ি বুকিং দিয়ে রেখেছি কাল সারাদিনের জন্য, ভাড়া ৩০০০ রুপি। নেশভোজে চিকেন কারি, সাদা ভাত আর ডাল, অমৃত না হলেও বিঘাদ নয়।

ভোর চারটায় সুমো নিয়ে উপস্থিত চালক। আমরাও প্রস্তুত। দার্জিলিং থেকে ১১ কি.মি. দূরের প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে টাইগার হিল। ৪৫ মিনিটের শীতজরি শেষে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দর্শনের প্রতীক্ষা। আমাদের আগে পরে শত শত মানুষ উপস্থিত কাঞ্চনবাজ্য উদীয়মান সুর্যের প্রথম রশ্মি বিচ্ছুরণের বিরল সাক্ষী হতে। বিধি বাম! সারা আকাশ আজ মেঘের রাজ্য বিলীন। রবি উদয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও ক্ষীণ। শীতে কম্পমান ০৮ বছরের শিশু কিংবা উবুখুবু বয়স্ক নারী-পুরুষ। কারও মুখমণ্ডলের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া, বিষণ্নতার টেউ সর্বত্র বিদ্যমান। কাঞ্চনবাজ্যার ঠেঁটে রবিরশ্যার প্রথম চূম্বন-দর্শন থেকে বঞ্চিত মানুষগুলোর সঙ্গে নিজেদের সহমর্মিতা ভাগভাগি শেষে ‘বাতাসিয়া লুপ’ এ গন্তব্য এবার। ভোরের আলো ফোঁটার আগেই পাইন বনের মাঝে দিয়ে টাইগার হিল থেকে ‘বাতাসিয়া লুপে’ যাওয়া অনেকটা অমরাবতী যাত্রাসম। নিবিড়, কোলাহলহীন, শান্ত প্রকৃতি, মনের অভ্যন্তরকে পরিত্র-নির্মোহ করতে বাধ্য। আধ ঘণ্টায় গন্তব্যে উপস্থিত।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় যে সব গোর্খা নাগরিক নিজেদের জীবনদান করেছিলেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার নির্দর্শনস্বরূপ বাতাসিয়া লুপে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যটকরা টাইগার হিল থেকে সরাসরি এই গন্তব্যে প্রবেশ করে। ফলে একটা সকালবেলার প্রশান্তি মনের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল হয়; শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাও গাঢ় হয়। চাইলে বিশ রূপিতে দীর্ঘ দূরবীণের সাহায্যে পুরো দার্জিলিং কাছ থেকে দেখার সুযোগ রয়েছে এখানটায়।

বাতাসিয়ার নিচে কনকনে ঠান্ডায় গরম গরম পিংয়াজু, চপ, ছোলা আর গরম চায়ের যে নিবিড় আবেশ তার তুলনা শব্দ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। হলফ করে বলতে পারি, পেটপুরে মনভরে খেলেও আপনার গ্যাস্ট্রিক মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না। ফ্রেশ, স্লেফ ফ্রেশ ভাজাপোড়াগুলো রসনায় লেগে থাকবে দীর্ঘদিন।

পরের গন্তব্য পাশেই ‘ঘূম মনেস্ট্রি’ পাহাড়ের উপর ছোট বৌদ্ধ মন্দির। ভেতরে অযত্ন পরিলক্ষিত; পবিত্র স্থান আরও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

‘ঘূম মনেস্ট্রি’র অভ্যন্তরের অপরিপাটি প্রকাশ, প্রভাতের সৌন্দর্যে এক ফোঁটা বিশাদের নীল রং চেলে দিলেও পরের গন্তব্যটা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। নাশতাকার্য সমাপন করেই ‘রক গার্ডেন’ এ যাত্রা শুরু। পাহাড়ের বুকে বুকে সারি সারি চা বাগানের সমারোহ। উচু পাহাড়ে উঠে আবার নিচে নামার সময় চারদিকে শুধু চা বাগান আর ফুলের বিভার। মেঘ, পাহাড়, ফুল আর চায়ের এক ভুবনমোহীন সৌন্দর্য, আপনার চোখ ছানাবড়া হতে বাধ্য। যত নিচে গমন করা যায়, চা বাগানগুলো ততই নিবিড় হয়ে শরীর স্পর্শ করে যেন। রাস্তাও চমৎকার। গার্ডেনে প্রবেশপথেই প্রচুর গাড়ি। টিকেট কেটে প্রবেশ করতে হয়। বাগানের প্রবেশদ্বারেই বার্নার হিমেল আবহ শীতপ্রভাতকে আরেকটু উপভোগ্য করবেই। অসমৰ পরিচ্ছন্ন ভেতরটা। চাইলে উপরে বার্নার উৎপত্তিশূল পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, অত কষ্টসাধ্যও নয়। ঘণ্টা দুয়েক নিমিমেই সাবাড় হয়ে যাবে ওখানটায়। রক গার্ডেন থেকে ফেরার পথে দু’পাশে অসংখ্য ভিউ পয়েন্ট। সেলফিপ্রিয় পর্যটকদের কাছে ওই পয়েন্টগুলো একদম স্বর্গ, শুধু স্বর্গ।



হাঁটতে হাঁপিয়ে গেলেও ক্লান্তি ভর করবে না দু’পায়ে।

পেট বলছে তখন দুপুর সমাগত। জম্পেশ দুপুরের আহার হলো বাঙালি থালিতে। গন্তব্য এবার টি গার্ডেন।

‘টি গার্ডেন’গুলো আমার পরে দেখা চা বাগানগুলোর মতো অত সুন্দর নয়। মিরিকের চা বাগানগুলো যেমন ছবির মতো তাকিয়ে থাকে,

অমনটা নয়। নোংরা, সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়।

টি গার্ডেনের প্রবেশমুখে তেনজিং রক। প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের নামে একটি বিশাল পাথরখঙ্গ স্থাপন করে রাখা হয়েছে ওখানে। Himalayan Mountaineering Institute (HMI) এ প্রশিক্ষণ নিতে আসা অভিযাত্রীদের প্রাথমিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে এই তানজিং রক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পর্যটকবৃন্দ ৫০ রূপির বিনিময়ে এই পাথরখঙ্গের চূড়ায় আরোহন করতে পারেন। দ্রুত সময় দেখছেন হাফিজ ভাই। চারটায় ট্রেন। টয় ট্রেন, এক্সাইটিং ইভেন্ট!



টয় ট্রেন সকল পর্যটকের কাছেই অতিশয় আরাধ্য জার্নি। বছর দুয়েক আগে শিমলা, মানালি ভ্রমণে সময় স্বল্পতায় টয় ট্রেন সওয়ার হওয়া অধরাই থেকে গিয়েছিল। এবার ৮০৫ রূপিতে পূর্বেই ডিজেল চালিত ট্রেনের টিকেট খরিদ করে রেখেছি; কয়লাচালিত ট্রেনের ভাড়া ১৩১০ রূপি। বিকেল ০৪.২০ থেকে দুঁষ্টায় রেলভ্রমণ। পাহাড়ী শহরের ভেতর দিয়ে পিপড়াগতিতে চলছে 'জয় রাইড' নাম টয়। বাইরে মুশলধারে বৃষ্টি; ট্রেন চলছে ট্রামের মতো; দার্জিলিং স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে; প্রথম বিরতি বাতাসিয়া লুপ। এই জায়গাটি গোলাকার। টয় ট্রেন পুরো এলাকাটি একবার প্রদক্ষিণ করে গোর্খা সূতিস্তরের প্রতি শ্রদ্ধার নির্দর্শনস্বরূপ। পরের স্টেশন ঘূম, পৃথিবীর সবচে উঁচু রেলওয়ে স্টেশন। অনুভূতি আকাশ ছোঁয়ার থেকে কম নয়। নিজেকে নিয়ে গর্ব করার আরও একটি উপাদান যোগ হলো বলে একটু অহঙ্কার হতেই পারে হাফিজ ভাইয়ের। দুটো স্টেশনে যাত্রাবিরতিতে যাত্রীবৃন্দ কফি-চা পান করতে পারেন। ঘূম থেকে আবার দার্জিলিং স্টেশন। পৌঁছতে সন্ধ্যা লেগে যাবে, ০৬.২০।

দার্জিলিং কেনাকাটার শহর। প্রচুর দোকানী হরেক রকমের শীতলপোশাকের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। দুঁশ' থেকে দুঁহাজার; নিশ্চিন্তে সওদা করতে পারেন। পাহাড়ীরা ঠকায় না। সঙ্গীরা প্রচুর কেনাকাটা করলেন। আমার হাত খাটো বলে শুধু চেয়ে দেখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাতের আহার রংটি, সবাজি আর তিম ওমেলেট ভাবল। অমৃত বৈকি!



সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই সকলে রেডি, গন্তব্য দার্জিলিং থেকে ৩৫ কি.মি. দূরের কালিম্পং। দার্জিলিংয়ের চেয়েও কালিম্পংয়ের প্রতি কেন যেন আত্মিক অনুভূতিটা আমার বেশি প্রথর ছিল। 'সোনার খোঁজে কেউ কত দূর যায়, আমি কালিম্পং!' কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা মনের ভেতরটায় আঙুত মাদকতা সৃষ্টি করে। পাহাড়ি রাস্তা হলেও প্রশস্ত, দু'পাশে মাইলের পর মাইল পাইন বন; প্রচুর ভয়ঙ্কর সুন্দর বাঁক; অতি উঁচু মেঘলা আকাশের মেঘেরা যেন রাস্তা পার হচ্ছিল; সে এক বিস্ময়; এক রোমাঞ্চ!

'আমার এ পথ তুমি দিয়াছ করিয়া মধুর।'

আহ! প্রশান্তির পরশ।

ঘন্টাখানেক পরে যাত্রাবিরতি। উঁচু পাহাড়ে রাস্তার পাশে কিছু ফলের দোকান; নিচে তিঙ্গা নদী। নদী ধরে কিছুদূর এগোলে

রাফটিং পয়েন্ট। দুঁষ্টায় কালিম্পং শহর। প্রথমেই ক্যাকটাস বাগান। সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় বেড়ে ওঠা এই বাগানে বিশ্বে বিরল হরেক রকমের ক্যাকটাস রয়েছে। বাগানের কর্ণধার তার দক্ষিণ আফ্রিকান বন্ধুর কাছ থেকে ক্যাকটাসগুলো সংগ্রহ করেন বলে 'বৃত্ত ছেড়ে' টিমকে জানান। ভেতরে চেরি ফলের গাছ প্রত্যক্ষ করলাম। কালিম্পংয়ের সেরা জায়গা হিসেবে ইতোমধ্যেই পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই ক্যাকটাস বাগান। চুক্তে টিকেট লাগে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যেই ডেল পার্ক, এক স্বর্গরাজ্য। সাজানো, ছিমছাম, পরিকল্পিত, পরিষ্কার পাহাড়ী পার্ক। খোলা জায়গা, প্রকৃতি-দর্শনের প্রচুর ভিউ পয়েন্ট। বিভিন্ন সিনেমা, সিরিয়ালের শৃঙ্খিয়ের জন্য স্থানটি প্রসিদ্ধ। সিরিয়ালপ্রিয় বাঙালির প্রিয় 'ফাণুন বড়' এর শৃঙ্খিটি হচ্ছিল সেদিন! ডেলে ইচ্ছে করলে প্যারাগ্লাইডিং করা সম্ভব, তবে নেপালের পোখারা থেকে এখানে খরচ, ঝুঁকি দুটোই বেশি। পার্কের পাশেই কালিম্পং সায়েন্স সেন্টার। টিকেট কেটে প্রবেশ করতে হয়। তেমন আহামরী কিছু নয়, কলকাতা সায়েন্স সেন্টারের কাছে ওটা নস্য। পাশেই হনুমান মন্দির। গেলাম, ছবি তুললাম, চলে এলাম। হনুমান মন্দির থেকে মঙ্গলধাম।



মঙ্গলধাম এক শান্ত পবিত্র মন্দির। কোলাহলহীনতার এক শুচিশুভ্র নির্দর্শন ওই দেবালয়টা মনের ভেতর এক ধরনের শান্তির পথন বইয়ে দেয়। পরনামি গোষ্ঠীর এই মন্দির তৈরি হয়েছে ১০৮-তম গুরু মঙ্গলদাসজি মহারাজের পুণ্য স্মৃতিতে। গোলাপি রঞ্জের মন্দিরটি পবিত্রতার আরক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল সমাগত; আহার করা কর্তব্য। প্ল্যান সংক্ষিপ্ত করে আহারে মনোযোগ সকলের। সমাপান্তে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। মেঘ পিছু ছাড়ছে না, সঙ্গে আকাশ আর রাস্তার লুকোচুরি চলছে। ওই মেঘ মাঝে মাঝে গাড়ির কাঁচ চুমে যাচ্ছে।

জীবন সুন্দর! আরও সুন্দর এই বেঁচে থাকা!

কাঞ্চনবাজাচুড়ায় রবির প্রথম চূমনদর্শন থেকে টাইগার হিল বধিত করলেও হাল ছাড়িনি। এবার আরও নিকটসাক্ষী হওয়ার বাসন। গন্তব্য সান্দাকফু, পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ চূড়া (৩৬৩৬ মিটার, ১১৯৩০ ফুট); শৈল যেখা গগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। উত্তেজনায় রাত্রিনিদ্রা উধাও। প্রত্যুষেই দার্জিলিং ত্যাগ বরাবরের মতো টাটা সুমোতে।

দার্জিলিং থেকে কিছুদূর গেলে সুখিয়া; সেখানে দুটো পথ। একটি মিরিক হয়ে শিলিঙ্গড়ি, অপরটি মানেভাঙ্গন। ২৫ কি.মি. দূরের মানেভাঙ্গন পৌছতে ঘন্টাখানেক সময় ব্যয় হয়। ৭০৫০ ফুট উচ্চতার মানেভাঙ্গন ছোট শৈল শহর। সান্দাকফু ট্রেকিংয়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা এখানেই সারতে হবে। ট্রেকারদের জন্য মানেভাঙ্গন টু সান্দাকফু এক স্বর্ণীয় পথ। ৩১ কি.মি. দূরের সান্দাকফু পৌছতে ট্রেকিংপ্রিয় পর্যটকবৃন্দ সাধারণত ০২/০৩ দিন সময় নেন। সময়সংলগ্নতায় আমাদের যাত্রা অবশ্য পদব্রজে নয়, ল্যান্ড রোভারেই সম্পন্ন হয়েছিল। পথগুলোর দশকে ব্রিটিশের পাহাড়ে ল্যান্ড রোভার গাড়ির প্রচলন শুরু করেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যের এই ল্যান্ড রোভারের যাত্রী হওয়াটাও কম সুখের নয়।

মানেভাঙ্গনের দুটো চেকিং পয়েন্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে যাত্রা শুরু। সামনে মেঘ পাহাড়ের অপূর্ব শোভার অপেক্ষা। উঁচু খাড়া সর্পসদৃশ পথে ধীর গতিতে এগোচ্ছি। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি রড়োনেন্ড্রন আর ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছগুলো দু'হাতের ডালা ভরে স্বাগত জানাচ্ছে। সঙ্গে থাকা গাইড আদিত্য পরিষ্কার ইংরেজিতে জানিয়ে দিল, সামনের সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে বিশ প্রজাতির রড়োনেন্ড্রন রয়েছে। খানিক পূর্বের বৃষ্টিতে লাল রড়োনেন্ড্রনগুলো আরও সজীব, সতেজ হয়ে হর্ষপ্রকাশ করছে যেন।

শ্বেতশুভ্র ম্যাগনোলিয়াগুলোও শুচিতার পরশ বোলানোর জন্য ঠাঁই দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথ তো নয় যেন এক বনবীথি। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই শৈলহ্রাম লামেধুরা। চা বিরতি। পাহাড়ের বুকে এক পাহাড় সুখ! লামেধুরা একটি নেপালি গ্রাম। মানেভাঙ্গন থেকে সান্দাকফু যেতে



নেপাল-ভারত, ভারত-নেপাল ধরেই যেতে হয়। পাহাড়ের যে সীমান্ত নেই! কচ্ছপগতিতে একেবেঁকে চলছে ল্যান্ড রোভার। চারপাশে শুধু মেঘের হাতছানি। প্রবল শীত শরীরে ধাক্কা দিলেও মনকে টলানোর শক্তি বেরসিক ওই বন্টটার নেই নিশ্চয়ই। পাহাড়ের চরিত্র বোৰা সত্যই দায়! এই বৃষ্টি, পরক্ষণেই রৌদ্র। মেঘের ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই চলে এসেছি মেঘমা। ছোট থাম; রাস্তার এ পাশে নেপাল, ওপাশে ভারতীয় চেক পোস্ট। সর্বদা মেঘাবৃত এই স্থানটিতে একটি বৌদ্ধ মনেস্ত্রি রয়েছে। শীতলতম মেঘমায় তৃতীয়বারের মতো নিরাপত্তালিখন সমাপ্ত করে ফের চলা শুরু। কিছুক্ষণের মধ্যে তৎলু হয়ে নেপালের তুমলিং ফাটক। ফাটক নেপালি শব্দ, বাংলায় মোড়। বেশিরভাগ ট্রেকার এখানেই রাত্রিযাপন করেন; হোম স্টের সুব্যবস্থা রয়েছে এখানটায়। কিছুক্ষণ বিরতি। মেঘের রাজ্য এককাপ গরম চা সঙ্গে চাওমিন। মেঘগুলো বিনা অনুমতিতে একদম ঘরের ভেতরে চুকে যাচ্ছে যেন। শরীরের বহিদেশের মোটা আস্তরণ উপক্ষা করে মেঘেদের আঘাত সহ্য করতে পারলে তুমলিং সেরা শাস্তির নির্ভেজাল স্থান হিসেবেই বিবেচিত হবে।

শৈলসৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে থাকা পর্যটকদের কাছে তুমলিংয়ের হাড় কাঁপানো শীত তুচ্ছ; যদিও পাহাড়ের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠান্ডার প্রকোপ বাড়ছিল। তুমলিং থেকে ০৮ কি.মি. দূরে গৈরিবাস। সময় যত গড়াচ্ছে, রাস্তা তত বিপদসঞ্চল প্রতীয়মান হচ্ছে। ঘন কুয়াশা আর মেঘমালা ভেদ করে ল্যান্ড রোভার ধীরগতিতে এগোচ্ছে, কয়েক হাত দূরের কোন কিছুই দৃশ্যমান নয়, বিশেষায়িত চালক ছাড়া এই পথ পাড়ি দেওয়া কঠিন। রাস্তার ওপরে এবড়ো থেবড়ো বসানো পাথর আর খাড়া উঁচু পথ যে কোন সাহসী মানুষের কাছ থেকেও সমীক্ষ আদায় করত যথেষ্ট। তবে, বরাবরের মতো রডেডেন্ড্রন আর ম্যাগনোলিয়ার বীথিকা চোখ জুড়িয়ে দেয়।

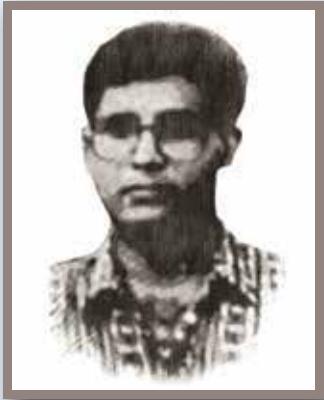
গৈরিবাস একটা উপত্যকার মতো। দুই পর্বতের মাঝখানে কিছুটা সমতল ভূমি। এখানে এসএসবি'র একটি ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। রাস্তার বামপাশে দুটো নেপালি দোকান; চা-চাওমিন ভালই জমবে।

ফের চলা শুরু। পরের বিরতি ০৩ কি.মি দূর কইয়াকাটা। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পাহাড়ি বৃষ্টির বামবাম বোল এক ধরনের মাদকতা সৃষ্টি করলেও সুতীব্র শীতের কাছে হার না মেনে উপায় ছিল না।

কইয়াকটার পর কালোপোখারি; মেঘ যেখানে হাতের স্পর্শ পাওয়ার জন্য উদ্ঘৰীব থাকে। এখানে একটি লেক রয়েছে, ছোট; স্থানীয়দের কাছে যেটি 'স্ট্রাটার পবিত্র আশির্বাদ' বলে গণ্য। গাইডের কাছ থেকে শুনেছি, ডিসেম্বরের বরফরাজ্যে কালোপোখারির সমন্টাই বরফাবৃত থাকলেও এই পবিত্র লেকের পানি অজ্ঞাত কারণে পানিই থাকে, বরফে রূপান্তরিত হয় না। সামনে বিকেভাঙ্গন। দুপুরের আহার ওখানেই। ভাতের সঙ্গে ডাল আর ডিমভাজি। সান্দাকফু থেকে আর ০৩ কি.মি. দূরে আমরা। বৃষ্টি নেই, বালমলে রোদ। মেঘ সরে যাওয়ায় বৃষ্টিম্বাত পাহাড়গুলোকে একেকটা স্বর্গখণ্ড বলেই ভ্রম হচ্ছিল। সতেজ পাহাড়ের ভেতরের উত্তেজনার ধাক্কায় দ্রুতই পৌঁছে গেলাম সান্দাকফু, পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ চূড়া; সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি স্বপ্নের সত্যপ্রকাশ।

ঠান্ডায় জমে যাওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আকাশ পরিষ্কার, তবে সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত না। আদিত্যের কথায় মন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। আকাশে মেঘাধিক্য এভাবে বর্তমান থাকলে আজকালের মধ্যে কাঞ্চনবাজ্জার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। দ্রুত রাতের আহার সমাপ্ত করে যার যা কিছু শীতবন্ধ পরিধান করে একাধিক মোটা কম্বল গায়ে মুড়িয়ে ঘূম, দীর্ঘ ঘূম। প্রার্থনা আগামীকালের স্বচ্ছ আকাশ। প্রভাতের গোমরামুখো আকাশ মন খারাপের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছে। সময় যত গড়াচ্ছিল, মেঘ যেন নিকটাকাশকে ততই গ্রাস করছিল। সর্বোচ্চ চূড়ার কাছে এসে কাঞ্চনবাজ্জার দেখা না পেয়ে অবশ্যে নিরাশ বদনেই ফিরে চলা। সান্দাকফুর আকাশে দৃশ্যমান কাঞ্চনবাজ্জার রৌদ্রচূড়া অধরাই থেকে গেল।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।



জ্ঞান বিকাশে সাঁদত কলেজ

মো. আবদুজ্জ ছাত্র

বঙ্গের আলীগড় খ্যাত সরকারি সাঁদত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক ১৯২৬ সালে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায় ও উচ্চ শিক্ষা বিষ্টারে এর গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। অবিভক্ত বাংলার নিপীড়িত জনগণের পাশে থেকে এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এ কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর বীরত্বের কথা বাংলাদেশ জুড়ে। আমি এ কলেজের ছাত্র। এ পরিচয় আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের। এখানে আমার স্মৃতি অনেক। এ প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৯২ সালে আমি স্নাতকোত্তর ডিপ্লি অর্জন করি। এ কলেজে অধ্যয়নের মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করেছি- গ্রামীণ, সুবিধাবণ্ণিত ও তৃণমূল পর্যায়ের মেধাবীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দানের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কলেজিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর ভিতরের সৃজনশীলতা বিকাশের যে অনবদ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা আজও অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়নের যুগে সময়োপযোগী ভাবনা-কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য এই কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং একই সঙ্গে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানকারী দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতেও অবদান রাখছে।

এ কলেজের যে কোনো সাফল্য ও অংগতির সংবাদ আমাকে আনন্দিত করে। এ কলেজের অংশ্যাত্মা আরও গতিশীল হোক, সুন্দর হোক- আমি সেই কামনা করি।

লেখক : প্রাক্তন ছাত্র, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ এবং উপ-রেজিস্ট্রার ও সচিব, ভাইস-চ্যাসেল দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।





আবার সিলেট মিনারগুল ইসলাম

ভ্রমণ মানুষের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে অনাবিল আনন্দ সেই সাথে অভিজ্ঞতার ঝুলি, যার ফলে ভ্রমণ পিপাসু মানুষটি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় নানা আঙ্গিকে। তাই ভ্রমণ করতে আমারও খুব ভালো লাগে। সুযোগ পেলে আমিও ছুটে যাই নিসর্গের সাথে মিতালি জুড়তে।

আমার এবারের ভ্রমণটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এবার আমি পরিবারের সাথে নয়, দু'জন প্রিয় ও বিখ্যাত মানুষদের সাথে ভ্রমণ করতে পেরেছি, আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছি অনেক বেশি। একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মো. এনায়েত করিম। আরেকজন তরঙ্গ প্রজন্মের অন্যতম লেখক বঙ্গবীর কবি এনায়েত করিম। তাদের সাথে এই ভ্রমণটি আমার স্মৃতির আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে থাকবে অনন্তকাল। আজকে আমি সবার সাথে সে ভ্রমণটির কথাই আলোচনা করবো।

পরিবারের সাথে সিলেট ঘূরতে যাওয়া হয়েছে অনেকবার কিন্তু পরিবার ছাড়া এই প্রথম যাওয়া। ঘুরাঘুরিটা আমার সাথে ভালোভাবেই যায়। এই কথাটা এনায়েত করিম স্যার ভালোভাবেই জানতেন। আমার স্কুল জীবনের শিক্ষক ছিলেন উনি। উনার সাথে আমার এখনো আড়ত দেওয়া হয় বা সম্পর্কটা আগের মতো। ধারণা করতে পারেন উনি এত বছর পরেও আমাকে কতটা ভালোবাসেন। তো উনি হঠাৎ সন্ধ্যায় আমাকে ফোন দেয়। বলে তুমি কোথায়? যথাযথ উত্তর আমি বাসায়। উনি বললেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মো. এনায়েত করিম যিনি কাদেরিয়া বাহিনীর প্রশাসক তার সাথে সিলেটে হরয়ত শাহজালালের মাজার জিয়ারতে যাবো। তুমি কী আমাদের সাথে যাবে? আমি এক কথায় সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমার আলাদা একটা আবেগ, ভালোবাসা ও শুদ্ধি কাজ করে। আমি নির্দিষ্ট দিন তারিখ সমন্বে অবগত হয়ে যাওয়া নিশ্চিত করলাম।

আমার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আরেকটি বিষয় যখন জানতে পারলাম তখন আমার যাত্রায় যি কাঞ্চন মতি যোগ হয়ে গেল, আর তা হলো আমরা ভ্রমণে যাচ্ছি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম সাহেবের গাড়িতে চড়ে আর ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত বঙ্গবীরের বাসভবনে আমাদের যাত্রাবিরতি সেই সাথে তার পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ। কথাটা শুনেই মনে আনন্দের লাভ ফুটছিল।

আমরা খুব ভোরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মো. এনায়েত করিম সাহেবের বাসা থেকে যাত্রা শুরু করি। আমাদের সাথের ড্রাইভার লিটন ভাই চমৎকার একজন মানুষ। তাছাড়া এনায়েত করিম দাদু খুবই ফ্রি মনের মানুষ। আমরা সারা রাত্তি অনেক গল্প ও মজার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে অবস্থিত বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম এর বাসায় এসে উপস্থিত হলাম দুপুর ১২ টায়। সেখানে যেয়ে আমি আরেকটু ব্যবাক হলাম এটা জেনে যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম বড় আমাদের জন্য সকাল ১০

টা থেকে রান্না করে অপেক্ষা করছে। এত বড় একজন মানুষ অর্থ তার আতিথেয়তা, মাত্সম স্নেহ আমাকে শুধু অবাক করেনি বরঞ্চ আগুত করেছে। এনায়েত করিম স্যার ও এনায়েত করিম দাদু দুজনের বদান্যতায় হিমালয়সম মানুষকে কাছ থেকে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করলাম, বিশেষ করে এনায়েত করিম স্যারের প্রতি তার যে স্নেহ অবলোকন করলাম তা আমায় সত্য বিশ্মিত করেছে। লোকে বলে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। এনায়েত স্যারের মতো লোকের সঙ্গ পেয়ে মাতৃত্বের মহান গুণ সম্পন্ন মহান মানুষটির স্নেহে ধন্য করলাম নিজেকে। তাছাড়া আগেই শুনেছি স্যারের সাথে ও এনায়েত করিম দাদুর সাথে এই পরিবারের নিবিড় সম্পর্কের কথা। আজ তা স্বচক্ষে অবলোকন করলাম।

যাহোক আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিদায় নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কিন্তু এবারে আমাদের গাড়ি পরিবর্তন করতে হবে। কারণ এই গাড়িতে একটু সমস্যা ছিল, তাই বঙ্গবীর আমাদের জন্য আরেকটি গাড়ি আগেই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা তিনজন সহ

বঙ্গবীরের ড্রাইভার ও নতুন গাড়ির ড্রাইভার অর্থাৎ দুঁজন ড্রাইভার সহ মোট পাঁচ জন সিলেটের পথে রওনা দিলাম। আমরা ঠিক রাত ৯.৫০ এ হরযত শাহজালালের মাজার সামনে যায়। যথাযথ ভাবে প্রথম আমরা একটা হোটেল এ উঠি। আমরা হরযত শাহজালালের মাজার রাত ১১টার দিকে তুকি তখন মাজারে মানুষ বলতে তেমন ছিলো না। কিছু মুসাফির ও পাগল আছে। যেহেতু রাত ১০টায় হরযত শাহজালালের মাজার এর দরজা বন্ধ করে দেয় আমরা চুক্তে পারিনি কিন্তু সবাই চলে আসলো কিন্তু আমি উনার মাজার এর পাশে একা কিছু সময় একা বসার সৌভাগ্য হয়েছে। আপনা যারা শাহজালালের মাজার গিয়েছেন। যায়গাটা কতোটা নিরব আসে পাশে বড় বড় পীর মুরশিদ এর করব। আমি সে খানে একটা ৫ মিনিট ছিলাম। কখনো কঞ্চনা করতে পারিনি একটা হরযত শাহজালালের মাজার এর পাশে আমি বসতে পারবো। আমার জীবন এর স্মরণীয় একটা মুহূর্ত ছিলো। মনে হলো আমি অন্য একটা জগতে চলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হলো এখনে আরও কিছু সময় থাকতে পারলে ভালো লাগতো। আমি মাজার পছন্দ করতাম বা করি। কিন্তু আমার জীবন এর এই ৫ মিনিট ভোলার মতো না। যেহেতু অনেক রাত আর আমরা সবাই ঝাল্ট, তায় রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে যায়। বলে রাখা ভালো আমি সকাল ১১ টার আগে উঠতে পারি না কেউ ডাক না দিলে। আমার সাথে যারা চলাচল করে সবাই জানে কিন্তু আমি সে দিন রাত ২ টার পরে ঘুমায় আর সকাল ৫ টার আগে আমি উঠে পড়ি কেউ ডাক দেয়নি। অন্য অন্য দিন এর মতো ওই দিন কিছু করতে পারলাম না কেন জানি। সরাসরি মাজার এ চলে গেলাম। রাতে মাজার এর দরজা খোলা পেলাম সকাল ছিলো মানুষ ও অনেক কম বা নায় বলেই চলে। আমি সেখানে মনের মতো কিছু সময় একা কাটলাম এর পর। এরপর আশে-পাশে দেখবো বলে বের হলাম এর আগে বেশ অনেকবার এসেছি পরিবার এর সাথে চাই। কিছু চিনতে ঝামেলা হয়নি। হরযত শাহজালাল যে কৃপ থেকে পানি পান করতেন সে খানেও কিছু সময় ছিলাম, উনার মাজারে গজারি মাছ দেখলাম আর উনার মাজারে জালালি করুত আছে তাদের জন্য কিছু খাবার কিনেছিলাম সেগুলো দিলাম। এর পর আমি মাজার থেকে বের হয়ে হোটেল এ গেলাম স্যার বলে এত সকালে তুমি ঘুম থেকে উঠলে কি করে। আমি বললাম, জানি না কি করে উঠলাম। এর পর সকাল এর খাবার খেয়ে উনারে মাজার এ একটু ঘূরলো। এর গাড়ি নিয়ে আমরা হরযত শাহাপুরানের মাজার এর উদ্দেশ্য এ যাত্রা শুরু করলাম। হরজত শাহাপুরান এর মাজার থেকে থেকে টাঁগাইল এর উদ্দেশ্য এ দুপুর ২ টার দিকে যাত্রা শুরু করি। আসার সময় আমরা শ্রীমঙ্গল হয়ে আসি। কারণ সে খানে চা এর অনেক বাগান। আমরা চা-কন্যা ভাস্কর্য আসে পাশে চা বাগানগুলো দেখি।

আমি এর আগে বেশ অনেক বার সিলেট হরযত শাহজালালের মাজারে এসেছি কিন্তু এবারের মতো এতো সুন্দর মুহূর্ত আমার কাটেনি কারণ হরযত শাহজালালের মাজার এ গিয়ে আমার জীবন এর আশ্চর্য কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি ইনশাআল্লাহ বারবার ফিরে আসবো... আপনাদের গল্প মনে হলেও সত্য এই যে আমরা মোট ৫ জন ছিলাম তার মধ্যে দুজন ড্রাইভার ও আমরা তিনজন সফরসঙ্গী আমার বাকি দুই সফরসঙ্গীর নাম মিল আপনারা দেখেছেন আমার গল্পের ও আমাদের ড্রাইভার ছিল তাদের নামের মধ্যে মিল ছিল দুজনে ছিল আর আমার স্যার ও দাদুর নামও ছিলো এনায়েত করিম।

লেখক : অর্থনীতি, ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



নাটোরের বিখ্যাত ছিন ভ্যালি মো. মুসফিকুর রহমান লিয়ন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও শিক্ষার আরো একটি জগৎ আছে। বিশ্বের পরতে পরতে ছাড়িয়ে আছে শিক্ষার আলো। এই বাহিরের জগতের শিক্ষার আলোর প্রয়াসে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিং ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া। সরকারি সাংদত কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ প্রতি বছর নিয়মিতভাবেই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন করে থাকে। যার অংশ হিসেবে ইতিপূর্বে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় স্থানসমূহ যেমন— উত্তরা গণভবন, সারদা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা সফরের সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয় বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সুব্রত কুমার সাহা। সিদ্ধান্ত হলো ছিন ভ্যালি পার্ক, নাটোর ভ্রমণে যাওয়ার। যেহেতু অনেক দূরের গন্তব্য এবং সরকারি কলেজ এর বিভাগীয় শিক্ষা সফর, অনেক নিয়ম মেনে অনুমতি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়। চাঁদা সংগ্রহসহ নানা প্রস্তুতি গ্রহণ শেষে আমরা ১৩ জুন ২০২২ তারিখের অপেক্ষায়। বাস ছাড়ার কথা সকাল ০৬:০০ ঘটিকায়। সে কারণে অনেকেই কলেজের আসে-পাশে পরিচিত স্থানে ভ্রমণের আগের দিন এসে উপস্থিত হই। সে রাতও ছিল অনেক আনন্দ উল্লাসে মেঠে সিনিয়র ভাই এবং প্রাণের শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন প্রস্তুতির কাজে অংশগ্রহণ করি বন্ধুরা সবাই। বহু প্রতীক্ষার পর রাত কেটে ভোর হলো। ক্যাম্পাসে আসলো তৃতী বাস। এর মধ্যেই সহপাঠী, সিনিয়র-জুনিয়র শিক্ষার্থী সবাই আসতে শুরু করেন। আমরা সবাই বাসে উঠি। যথা সময়ে বাস ছাড়ে, ছুটতে থাকে নিজ গন্তব্যে (ছিন ভ্যালি পার্ক, নাটোর)। টাঙ্গাইল থেকে বাস ছাড়ার পর আমাদের টি-শার্ট দেয়া হয়। শিক্ষা সফরে সবাই একই পোশাক পড়লে সত্যি অন্য এক রকম ভালো লাগা কাজ করে। এর মধ্যে সকালের নাস্তা ও দিয়ে দেওয়া হয়। পথিমধ্যে সিরাজগঞ্জের “ফুড ভিলেজ” রেস্টুরেন্টে যাত্রা বিরতি দেওয়া হয় এবং ফিরে আসার পথে রাতের খাবারের অর্ডার সেখানে দেয়া হয়। ১০ মিনিট বিরতি শেষ করে আবার গন্তব্যে ছুটে চলা শুরু হলো। সবাই অনেক আনন্দ করি সারা রাত্তা। এভাবেই আমরা ১২:০০ ঘটিকার সময় ছিন ভ্যালি পার্ক, নাটোর যেয়ে পৌছাই। সেখানে যেয়ে আমরা সবাই যার যার মতো আলাদা ঘুরতে শুরু করি।

ওই দিন অনেক গরম পড়েছিল, প্রায় অসহ্য। আমরা কয়েকজন বন্ধু একসাথে আমাদের এই শিক্ষা সফরকে সৃতিময় রাখার জন্য প্রচুর ছবি তুলেছি। হঠাৎ দেখা প্রত্যাশিত পানির পুলের। অবশেষে টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ।

দীর্ঘ ২ ঘণ্টারও বেশি সময় সবাই মিলে পানিতে ছিলাম। তারপর সবাই একসাথে উঠে আসি। ততক্ষণে দুপুরের খাবারের সময়ও হয়ে যায়। একসাথে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা ঘুরা-ঘুরি শুরু করি। ঘুরতে ঘুরতে সবাই অনেক ক্লান্ত হয়ে পরেছিলাম। বিকাল ০৫:৩০ ঘটিকায় র্যাফেল ড্র করা হয়। আমাদের বন্ধুদের অনেকেই বিভিন্ন পুরস্কার বিজয়ী হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনেক কিছুই শেখার ছিল সেইখানে। এবার ফেরার পালা, মাগারিবের নামাজের পর টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে বাস ছেড়ে আসে। আসার সময় আকাশ ছিল মেঘলা, বৃষ্টিও হয়েছে। রাত আনুমানিক ০৯:৩০ ঘটিকার সময় আমরা ‘ফুড ভিলেজ’ রেস্টুরেন্টে আসি।

আমাদের যাত্রা বিরতি এবং রাতের খাবার দেওয়া হয়। রাতের খাবার খেয়ে আবার যে যার স্থানে বসি। এরপর বাস রাত আনুমানিক ১২:৩০ ঘটিকার সময় টাঙ্গাইল এসে থামে। এর মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বলতেই পারবো না। আমরা সবাই কলেজ প্রাঙ্গণে এসে নামি। কখন যে কেটে যায় আমাদের আনন্দঘন ঘটনাবহুল সৃতিমধুর এই শিক্ষা সফরের দিনটি!

লেখক : বিবিএ (অনার্স) ২য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, সেশন ২০১৯-২০২০।





সৃতিকথা

আন্দুর রহমান

এখন শীতকাল চলছে। সকালের বেশির ভাগ সময় কুয়াশায় ঢাকা থাকে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি। ফজরের নামাজ শেষ করে হাঁটতে বেড়িয়েছি। চারদিকে ঘন কুয়াশা। ঠাণ্ডা কুয়াশা এসে মাথায় চুলের সাথে আটকে যাচ্ছে। বাসা থেকে এক কিলোর মতো চলে এসেছে সামনে একটা সাঁকো তৈরি হয়েছে। প্রতিদিনি এই সাঁকো পর্যন্ত আসা হয়। আজকে মনে হলো সামনের এই বাচু দাদুর বাঁশঝাড় পর্যন্ত যাব। একটু একটু বাতাস বইছে। বাঁশঝাড় বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে নাচিতেছে। তো পেছনে ফিরে আসতেছিলাম এমন সময় ছোট একটা আওয়াজ আসলো কানের বাড়ান্দায় মিও! মিও!

পেছনে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, কয়েক কদম পা ফেলে আলোতে দাঁড়ালাম, পেছনে তাকিয়ে দেখি বাদামি রঙের একটি বিড়ালছানা। এই শীতের সকালে কে যেন তাকে ফেলে রেখে গেছে। কাছে ডাকলাম, আসে না, ভাবলাম নিজেই ওর কাছে যাই। আমি ওর প্রতি অহসর হওয়াতে পিছিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে মোটা একটা আমগাছ ছিল, সে খানে লুকালো। আমি বিপরীত দিক থেকে ওর একদম কাছে গেলাম, স্পষ্ট দেখতে পেলাম ও শীতে কাঁপছে। পশু-পাখির কষ্ট দেখে কখনো বসে থাকতে পারি না। একহাত দিয়ে তুলে আরেক হাতের তালুতে রাখলাম। কোনভাবেই কাঁপুনি থামছে না, অবশেষে গায়ের চাঁদর দিয়ে পেচিয়ে কোলে নিলাম। এখন মনে হলো ও আরামবোধ করছে। জিঙ্গাস করলাম— আমার সাথে যাবি? ও তো চতুর্পদ জন্ম, কথা বলতে পারে না। দিব্যশক্তি দিয়ে শুনতে পেলাম, সে বলল— আমায় নিয়ে চল। বাড়ির দিকে রওনা হলাম, বাড়ির উপানে এসে দেখি মা রান্না বসিয়েছে, ছোট বোন বই পড়েছে। ছোট বোনকে ডাক দিলাম— আয় দেখে যা কি নিয়ে এসেছি। এসে দেখল বিড়াল ছানা, এটা পেয়ে ও খুব খুশি হয়ে উঠল। মা জিঙ্গাস করল কোথায় পেলি?

বাচু দাদুর বাঁশঝাড়ের নিচে। ভালোই হয়েছে, এখন থেকে আর ইন্দুর জ্বালাতন করতে পারবে না। সকালের খাবার খাওয়ার সময় ওকে পাশে নিয়ে খেতে বসলাম, সাদা ভাত দিলাম খায় না। মা দিল মাছ-ভাত, একটু খাওয়ার চেষ্টা করল। দিনের বেলা ভালোভাবেই কাটল, রাতের দিকে এসে কান্না শুরু করে দিয়েছে। ওর মনে হয় মায়ের কাথা মনে পড়েছে। ধারণা করলাম সৃষ্টির সকল স্তরের কাছে মা সেরা ও অমূল্য সম্পদ। ওর কান্নার মায়ায় পড়ে গেলাম, প্রথম দিনেই ওকে কেন জানি ভালোবেসে ফেলেছি। বিছানায় নিয়ে গেলাম, আমার পাশেই একটা পুরনো কাঁথা মুড়িয়ে গুছিয়ে দিলাম হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। আমার ঘুম পেল, ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ও আমার পেটের উপর কাচুমাচু হয়ে শুয়ে আছে আর শ্বাস নিতেছে, কানে শব্দ আসতেছে। এভাবেই ওর দিনগুলি কাটতে লাগল। প্রতিদিন সকালে খাইয়ে রেখে স্কুলে যাই আবার স্কুল থেকে ফিরে এসে ওর খোঁজ নিই। আমার সাথেও বেশ মানিয়ে নিয়েছে ও।



ইঁদুর শিকার করা, লাফিয়ে গাছে উঠা, থাবা দিয়ে তেলাপোকা ঘায়েল করা, সব আয়ত্ত হয়ে গেছে। আমার সাথে যখন বসে থাকে, একটু হাত নাড়ালেই থাবা মেরে বসে। ইদানিং খুব জ্বালাতন করে, খেতে বসলেই সামনে এসে লুটিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে রাগ করে মারতে যাই লাঠি দিয়ে, একটুও সরে না, পিঠ পেতে বসে পড়ে মাটিতে। এমন করলে কি মার দেওয়া যায় নাকি। এইতো কিছুদিন আগে কেবল স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছি, খেতে বসেছি এই সময় বিরক্ত করা শুরু করল। জোরে একটা আছাড় মেরে দিছি, মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। মরে যায় যায় অবস্থা; এটা দেখে ছোট বোন আমাকে পিটাতে আসলো লাঠি দিয়ে, আমি দৌড়ে অন্যত্র চলে গেলাম।

সঙ্গে হয়ে গেছে ওর অবস্থা কেমন তা আমি জানি না, তবে বিশ্বাস এটাই যে ও বেঁচে আছে। দোকানে গেলাম, ওর জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাই তাতে যদি রাগ করে। পটেটো ওর খুব পছন্দ মচমচ শব্দ করে খেতে পারে। তাই বিস্কুট, পটেটো ও চানাচুর কিলাম। বাসায় ফিরে দেখি ছোট বোনের কোলে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে বললাম, আমার কাছে দে, দিতে চাইলো না। জোর করে কোলে তুলে নিলাম, আগের মতোই স্বাভাবিক আছে। বুরলাম না, চতুর্স্পন্দ জন্মের কি রাগ বলে কিছু নেই নাকি। একে একে চানাচুর, বিস্কুট ও পটেটো খাওয়ালাম, নিজেও খেলাম। এখন যেন মনের মধ্যে ত্বষ্টি পাচ্ছি। হাই স্কুলে পড়ার সময় ওকে অনেক সময় দিতাম। কিন্তু এই কলেজে, মানে মাধ্যমিকে এসে তেমন সময় দিতে পারছি না। বোনের সাথে ও এখন বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছে, আমি সময় দিতে পারি না বলে কাছে ডাকলেও আসতে চায় না, ধরে নিয়ে আসতে হয়। বাড়ির পরিবেশের সাথে ও বেশ মানিয়ে নিয়েছে। ওর এই মানিয়ে থেকে একটা বিষয় শিখেছি যে, “প্রাণির (বোৰা) অভিযোগন ক্ষমতা মানুষের থেকে কয়েকগুণ বেশি।” প্রাণী বলতে চতুর্স্পন্দ জন্মের বুরানো হয়েছে। এখন ও সব খাবার খেতে পারে, সাদা ভাত, নারিকেল, কুমুড়ের বোল তরকারি ও মুড়ি।

হৃটহাট ইঁদুর শিকার করে নিয়ে আসে, আধমরা করে রেখে দেয়, পরে ওই আঁধমরা ইঁদুর নিয়ে খেলা করে। এভাবেই বেশ কেটে যাচ্ছে ওর। শীতের শেষ হয়ে গরম এস গেছে। রাতে এখন আর বিছানায় থাকে না, মেঝেতে শুয়ে থাকে। গরমের দিনে মেঝে খুব ঠাড়া ও আরামদায়ক থাকে। মহল্লায় মাঝে মাঝে কোন অনুষ্ঠান ও গান বাজান হলে খিচুড়ি দেয়। আমি বাড়িতে এনে খাই ওকে সাথে নিয়ে। খাবার খাওয়া নিয়ে ও সব সময় পরিচ্ছন্ন ও সাবলীলভাবে শেষ করে।

বোৰা প্রাণীদেরও যে স্মার্টনেস বলে কিছু আছে ওর দিকে তাকালেই বুবা যায়। ধীরে ধীরে ও যে আমার পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে, শিশুর মতো কথা বলা ছাড়া প্রায় সব কাজ করতে পারে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কার্যক্ষমতাসম্পন্ন। আশে পাশের সব বাড়ি এখন ওর পরিচিত। বাড়ি থেকে বের হতে গেলে পেছন পেছন চলে আসে। এ বাড়ি ও বাড়ি চলে যায়। দুপুর বেলা ওকে পাওয়াই যায় না। সঙ্গের সময় বাসায় ফিরে। তবুও ওর যত্নের ক্রটি হয় না। বাড়িতে ওর অবস্থানের কারণে ইঁদুরগুলো পালিয়ে বেড়ায়, ক্ষতি করার সাহস পায় না।

ধীরেধীরে ওর বয়স বাঢ়তে লাগল আর পরিচিতিও। মাঝে মাঝে নতুন বিড়াল নিয়ে আসতো বাসায় আবার তাদের সাথেও যেত। কিন্তু রাতের বেলা কোথাও থাকতো না বাসায় এসে পড়তো। হঠাৎ দেখলাম একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ান্দায় রাখা সুপাড়ির ছোলার উপর বসে পা চাটছে। কাছে গিয়ে দেখি কে যেন কুপিয়ে দিয়েছে ডান পা টা। একদিন দুঁদিন পর ওখানে ইনফেকশন হওয়া শুরু হল। এখন খাবারও কম কম থায়। দশ-বারো দিনের মধ্যে এক পা একটু চিকন আকার ধারণ করল। “ঘা” এর ওখান দিয়ে সব সময় রান্ত ও পুঁজ বের হতো। ওর অতিরিক্ত চাটার কারণে শুকানোর সুযোগ পেত না পা টা, এইভাবে একমাস ভুগলো।

এখন কোন খাবার খেতে পারে না, কর্ণও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গত রাতে নরম কেক, পায়েস, মাছ এগুলো মুখের সামনে ধরলাম কিন্তু আহার করলো না। বুঝতে বাকি রইল না যে সময় শেষ হয়ে এসেছে।

রাতে আমার সাথে শুয়েছিল। সকালে বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না, ধরে উঠিয়ে আনলাম বাহিরে। আবুর কাছে ওকে রেখে আমি কলেজে চলে আসলাম।

কলেজ ও অফিস শেষে করে রাতে বাসায় গিয়ে জানলাম যে ও দুপুরে ছটফট করতে করতে করতে মারা গেছে। ও ছয় বছর সঙ্গ দিয়েছে, শিখিয়ে গেছে মানুষের সাথে পঙ্ক্র যে নিবিড় সম্পর্ক আছে তা সম্বন্ধে।

“ভালো যতো বেসেছ খণ্ণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু, বিদায়।”

লেখক : বিবিএস (পাশ কোর্স), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১।





বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অধ্যাপক শায়লা ইয়াছমিন

১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমি সর্বত্রই, একটি কথা বলি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকেই তাদের সৃষ্টি করতে হবে।” বঙ্গবন্ধুর সোনার মানুষ সৃষ্টির সে তাগিদ শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে যে ‘জাতীয় শিক্ষা কমিশন’ গঠিত হয় তা যেন বঙ্গবন্ধুর সে ইচ্ছার যথার্থ প্রতিফলন। এই কমিশনের রিপোর্ট পুরোটাই ছিল বিজ্ঞানবান্ধব। বিজ্ঞানমনস্ক, কারিগারি দক্ষতাসম্পন্ন, মানবিক গুণসমূহ মানবসম্পদই যে সোনার দেশের সোনার মানুষ তা বঙ্গবন্ধুর উপলক্ষিতে যথাযথই প্রতিভাত হয়েছিলো। তাই তো সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষানীতি প্রগয়নের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন একজন বিজ্ঞানীর হাতে। যুদ্ধবিধ্বন্ত একটি দেশের ঘুরে দাঁড়াবার জন্য যে শক্ত মেরুদণ্ডটি দরকার তা হলো শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু তাই শুরু থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়েছিলেন কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৭২ সালে ঘোষিত স্বাধীন দেশের (‘৭২-'৭৩ অর্থবছরের) প্রথম বাজেটে প্রতিরক্ষার চেয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি আইন প্রণয়ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈশ্঵িক পরিবর্তনের সূচনা করেন বঙ্গবন্ধু।

দেশ গড়তে শিক্ষা ও গবেষণার হাতে হাত রেখে চলার বিকল্প যে নেই, বঙ্গবন্ধু তা বুবাতে পেরেছিলেন বলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক-মানববিদ্যা বিষয়ক ও প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণার নিবিড় মেলবন্ধন তাঁর বিভিন্ন লেখা-বক্তৃতায় আমাদের শিখিয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, কৃষিক্ষেত্র, পরমাণু বিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল শাখাকে উন্নয়নের অংশ্যাত্মক সামিল করতে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন বেশ কিছু পদক্ষেপ। তাঁর সেই যুগোপযোগী ও ভবিষ্যতমুখী পদক্ষেপগুলোর ফলবন্ধুপ বাংলাদেশ আজ খাদ্যে অংশ সম্পূর্ণ, মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে স্যাটেলাইট, পৌছে গেছে পারমাণবিক শক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের দ্বার প্রাপ্তে।

বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমানে মূল ভূমিকা রাখা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এ লেখায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR):

স্বাধীনতার পর এ দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অংশ্যাত্মক ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে বি সি এস আই আর প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উৎসাহ, উদ্যোগ ও নির্দেশে বিশিষ্ট রসায়নবিদ ড. কুদরত-ই-খুদার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সংজ্ঞে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। ঢটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণাগার, ষটি ইনসিটিউট ও একটি সেন্টার এর মাধ্যমে বর্তমানে এটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC):

যুদ্ধবিধ্বন্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ খ্রি মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়। পরমাণু বিজ্ঞান এর মতো অতি পরিশীলিত এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ও অবদানের তাৎপর্য উপলক্ষ করে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শাস্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপপুর পারমণ্ডিক বিদ্যুৎ প্রকল্প:

এ অঞ্চলে পারমণ্ডিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৬১ সালে। পরবর্তীতে ১৯৬৩-৬৯ সময়কালে তৎকালীন সরকার প্রকল্পটি একরকম বাতিল করে দেয়। ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু এটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরপর বিভিন্ন ধাপে কিছু কাজ অগ্রসর হয়। বর্তমান সরকারের শাসনকালে ২০০৯-২০১১ সালের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২ অক্টোবর ২০১৩ সালে ১ম পর্যায়ের কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পারমণ্ডিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ২০১৫ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর অধীনে Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited (NPCBL) গঠন করা হয়।



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১:

তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের এক দশক পরই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ৩য় শিল্পবিপ্লবের প্রধান শক্তি বা হাতিয়ার “তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি” ব্যবহারে উদ্যোগী হন বঙ্গবন্ধু। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বিজ্ঞানমনক্ষ জাতি হিসাবে গড়ে উঠে এবং একটি আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনি দুটি পদক্ষেপ নেন। প্রথমটি, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলি-কমিউনিকেশন ইউনিয়নে (আইটিই) বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ। অন্যটি হচ্ছে, অত্যন্ত সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য সত্ত্বেও ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন। এ দুটি পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের যুগে প্রবেশ করে। জাতির পিতার এই দ্রুদৃষ্টি পদক্ষেপসমূহের ফলে আজ ৫৭তম দেশ হিসাবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। ১১ মে দিবাগত রাত (১২ মে, প্রথম প্রহর), ২০১৮ সালে কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশের ১ম ভূ-স্থিত যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ “বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১” উৎক্ষেপণ করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC):

কৃষির উন্নয়নে গবেষণার বিকল্প যে আর কিছু হতে পারে না, বঙ্গবন্ধুর গবেষণামনক্ষ পরিকল্পনা ও চিন্তাধারায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। ক্ষেত্রসমাজের সমৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি, সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল। এই ধারাবাহিকতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে ১৯৭৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণা সমন্বয়, পরিকল্পনা, গবেষণার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এর জন্য সংবিধিবন্দ সংস্থা হিসাবে “বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ‘বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ১৯৯৬’ প্রণয়ন এর মাধ্যমে কৃষি খাতের অধীনে শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও বন বিষয়ক উপর্যুক্ত সংগৃহীত দশটি জাতীয় গবেষণা ইনসিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে নিয়ে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) গঠিত হয়।

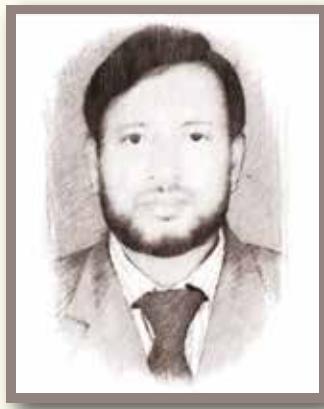
কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদা দান করেন। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন জগন ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এর জন্য উৎসাহিত করার নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে “জাতীয় কৃষি পুরস্কার” প্রবর্তন করেন।

আলোচ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছু রয়ে গেছে, যে সব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ নিয়েছিলেন এত স্বল্প পরিসরে তার সবকিছু তুলে আনা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এক আধুনিক, স্বনির্ভর জাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশে আজ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এর পাশপাশি ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গবেষণায় উদ্বৃদ্ধ করনের লক্ষ্যে “বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট” এর মাধ্যমে দেশে বিদেশে বৃত্তি প্রদান এর কর্মসূচি চালু হয়েছে।

জাতির পিতার শুরু করা কাজকে এগিয়ে নিতে, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষে, আজ বাংলালি মাথা উচু করে উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে তাঁরই সুযোগ্য কল্যান হাত ধরে। সর্বোপরি, মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত জাহাত জনতার বাংলাদেশ, ‘তলাবিহীন বুড়ি’র দুর্নাম ঝোড়েমুছে মহাবিশ্বের বিশ্বয় হয়ে ‘উন্নয়নশীল দেশ’ এর কানারে এসে দাঁড়িয়েছে।

- ‘মুজিব শতবর্ষ’ উদ্বাপনে লিখিত এ নিবন্ধের তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান-পদার্থবিদ্যা।



সূত্রিক পাতায় প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁ অধ্যাপক ড. মো. আশেকুল হাসান

টাঙ্গাইল জেলার ভূগ্রাপুরের এক অজপাড়াগাঁ ‘শাহবাজ নগর’, সেখানেই দুনিয়ার আলোর পরশ নিয়ে ১৮৯৪ সালে জন্ম নেন কালজয়ী কীর্তিমান পুরুষ প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁ। তিনি ছিলেন একজন সমাজসংক্ষারক প্রগতিবাদী প্রাণপুরুষ, তাঁর বস্তুনিষ্ঠ ধ্যানধারণা ছিল গণমানুষের মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত। সক্রেটিসের মতো তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিস্তারের মাধ্যমেই মানুষের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ও সমাজ নির্মাণের স্ফুর্দ্ধ দেখতেন। মানবতাকে লালন ও পালন করতেন চিন্তা ও চেতনায়, “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”, এই নীতি ও আদর্শ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর নিকট জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দেশ ও সমাজের উচ্চ-নিচু, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালোর কোন বৈষম্য ও বিজাতীয় বিদেশ স্থান পেত না।

তিনি সমাজের অবহেলিত জনপদকে কুশিক্ষা, অঙ্গতা, কুসংস্কার থেকে পরিব্রাগের প্রয়াস চালিয়েছেন লেখনির মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে, তাইতো তিনি আইন পেশা বিসর্জন দিয়ে হাল ধরলেন আটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্থী (চাঁদ মিয়া) প্রতিষ্ঠিত বাংলার আলীগড় খ্যাত সাংস্কৃত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইলের। দীর্ঘ (১৯২৬-১৯৪৭) ২২ বছরকাল অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে জ্ঞান বিস্তারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, এ দীর্ঘকালের মধ্যে একটি দিনও একজন ছাত্র বা কোনো অধ্যাপক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটি অশোভন কথাও বলেন নাই। আমার ছাত্র-শিক্ষকের তরফ থেকে দেওয়া এই বেগুনার ইজ্জত আমি থুই কোথায় (১)?

এই প্রাণপুরুষ একদিন করাচির পথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ এক যুবক এসে বলল, “স্যার, সালাম আমাকে করতে দিতে হবে, কদম্ববৃটীতো করবই। আমি যে আপনার ‘বালিশের ছাত্র’।” প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁ হতভস্ত ও হতচকিত হলেন, ছেলেটি বলে কি? পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল তাঁর, সেই করটিয়ার কলেজ ক্যাম্পাসের বাসায় একদা বিকেলে বসে আছেন, এমন সময় নেত্রকোণা (বর্তমান জেলা) হতে এক নেহায়েত গরীব ছাত্র সামনে হাজির। হোস্টেল সুপারকে স্লিপ দিয়ে বিনা খরচেতাকে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাত দশটার দিকে ছেলেটি এসে হাজির। ‘স্যার, পেট ভরে খেয়েছি, শোয়ার জন্য ভালো খাটও পেয়েছি; কিন্তু বালিশ যে নেই।’ বাসা ভর্তি মেহমান ও মুসাফির। অন্দরমহলে গেলেন তিনি, মাথায় দেয়ার নিজের দুটি বালিশের মধ্যে একটি এনে ছেলেটিকে দিলেন, যে বালিশের ওয়ারের উপর লেখা ছিল প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁ। হোস্টেলের ছেলেরা চিনে ফেললো। তার নাম দলি বালিশের ছাত্র।

নিজের এলাকায়, টাঙ্গাইলের ভূগ্রাপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে যার নাম ‘ইব্রাহীম খাঁ সরকারি কলেজ’। নিবিড় পাড়াগাঁ যেখানে দিনে দুপুরে শেয়ালের হাঁক, পাথির কলরব, বিঝি পোকার গুঞ্জন, এখন সেখানে গড়ে উঠেছে শহর, আলিশান মার্কেট। সে কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে দেশ ও জাতির খেদমত করছে।

মুরাবিদের মুখে শোনা (জনশ্রুতি), একদিন তিনি কলেজের প্রয়োজনে বাড়িতে গিয়ে টাকা-পয়সা ও ধান-চাল সংগ্রহ করতে ছিলেন, হঠাৎ একটি বাড়ি থেকে এক মহিলা বের হয়ে বললেন, ‘সাহায্য না ছাই দিমু’। তখন প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁ রাগ না করে বলেছিলেন, ছাই দিয়েই দেয়ার অভ্যাস কর মা।

বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণকে প্রতিষ্ঠা ও সরলীকরণ করা। তিনি যখন বাংলা শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন, তখন তিনিই সর্বগ্রহণ্য তাঁর অফিসে বাংলা ভাষাকে অফিসের ভাষার মর্যাদা দেন। যদিও তীব্র বিরোধিতার কারণে এ পদক্ষেপ সফল করতে পারেনি। তবে কি তিনি থেমে ছিলেন, না; হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য ডেক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিনিপাল আবুল কাশেম মিলে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা কলেজ, ঢাকা।

প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁর ছোটবেলার একটি ঘটনা থেকে গুরজনের নির্দেশ বা হৃকুম পালনে তাঁর মেধা ও বুদ্ধির প্রথরতার পরিচয়

পাওয়া যায়। একদিন সত্যমা তাকে বললেন, পানগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, একটি কলার পাতা কঁচ্টে আনত বাবা। তক্ষণি মায়ের হৃকুম পালন করতে ছুটে গেলেন কলার বাগানে (ছোপে)। দেখতে পেলেন এক একটি কলাগাছ ৮-১০ হাত করে ডুঁচ। কলার পাতাতো নিতেই হবে তাকে, এটা যে মায়ের আদেশ। এদিক সেদিক চেষ্টা করে শেষে মুহূর্তে একটি কলাগাছের কাছে বসে গোড়া কাটতে শুরু করলেন। এমন সময় বড় ভাই এসে বললেন, এখানে কি হচ্ছেরে ইব্রাহীম? ‘আমি কলার পাতা কাটছি।’ ‘কলার পাতা কাটবি তবে গাছের গোড়া কাটছিস কেন?’ ‘কলার পাতা যে নাঞ্জল পাই না ভাইজান।’ ‘তোকে কে কলার পাতা নিতে বলেছে?’ ‘মা, পান রাখতে হবে যে।’ বড় ভাই আবেগে আদর করে জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে গেলেন, মার সাথে কি বলে হাসতে লাগলেন দুজনে।

দাঙা নিরসনে তাঁর কালজয়ী পদক্ষেপ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। করটিয়া থাকাকালীন তাঁর নিকট সংবাদ এলো কলকাতায় হিন্দু মুসলিম ভীষণ দাঙা শুরু হয়েছে, এ প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলের চর এলাকার লাঠিয়াল বাহিনী টাঙ্গাইল শহরে হিন্দুদের বাড়িয়ার, বৌ-বীর সহায় সম্পদ লুট করবে। খবর পেয়েই টাঙ্গাইল গিয়ে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ নেতাদের ডেকে বললেন, আজকের রাতের জন্য চোখের ঘুমকে নদীর ওপারে তাড়িয়ে দিন। আজ আমাদের প্রত্যেকের জেগে থাকার রাত। কুমুদিনী কলেজ গেটে গিয়ে ছাত্রী ও অধ্যাপিকাদের ডেকে বললেন (তখন কিন্তু তারাও গোপনে লোহার চোখ শিক নিয়ে প্রস্তুত), তোমরা আমার মা, কেউ বোন, কেউ কন্যা। সবাই কলেজ হোস্টেলের ভিতরে চলে যাও। নির্ভয়ে ঘুমাও। আমি এখানেই পাহাড়ায় দাঁড়ালাম। আমার লাশের উপর ছাড়া কেউ এ আঙ্গিনায় পা দিতে পারবে না। এই হলো কালজয়ী মহারথি মহাপুরুষ প্রিসিপাল ইব্রাহীম থাঁ।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক অবদানের দিকে তাকালে দেখা যায়; তৎকালীন সকল সরকারি কাজ বাংলা ভাষায় করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে যে আরাকলিপি দেয়া হয়েছিল তাতে ডক্টর মুহুমদ শহীদুল্লাহ এবং ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের সঙ্গে প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁর স্বাক্ষরও সংযুক্ত ছিল, সে অবদানের কথা জাতি ভুলে যায়নি। তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির হৃদয়বিদারক ও দুঃখজনক ঘটনার জন্য ব্যক্তিত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের শাসকগণাষ্ঠীর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন, শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেনের নিকট, ঘটনাটি কেমন করে কেন ঘটল তা জানার জন্য (২)। এ ঘটনায় তাঁর সাহসিকতা, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও স্বাধীনচেতা মনোভাব এর ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে।

তিনি উকিল হয়ে আইন ব্যবসায়ের পরিবর্তে যেমনি শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলেন তেমনি সাহিত্য জগতে অনন্য নির্দর্শন রেখে গেছেন। তার লেখায় রসের সন্ধান পাওয়া যায়।

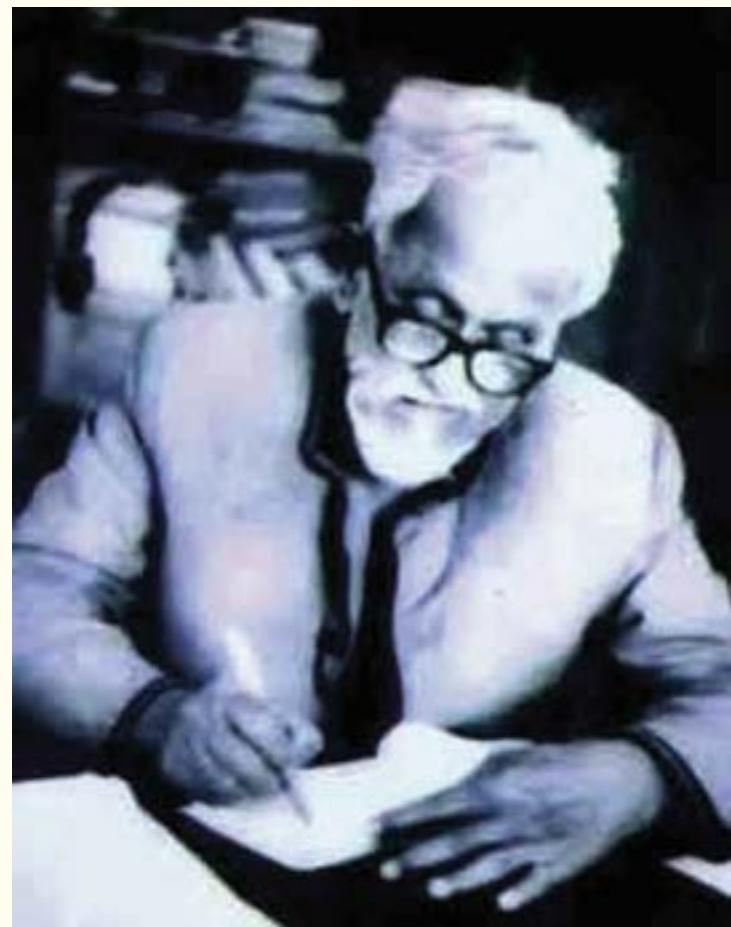
গহনা সম্পর্কে প্রিসিপাল ইব্রাহীম থাঁ লিখিত সেকালের ছড়া:

রংবন ঘরে বইসা বিবি মানজা দেখাইছে
ঢাকা থেইকা নওশা মিয়া শিকল পাঠাইছে,
ও শিকল ভালো না পিতল মিশাইছে।
রংবন ঘরে বইসা বিবি পাও দেখাইছে
ঢাকা থাইকা নওশা মিয়া খাড়ু পাঠাইছে,
ও খাড়ু ভালো না তামা মিশাইছে (৮)।

তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে অসংখ্য ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনী ও শিশুপাঠসহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি সাহিত্যজগতে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। দুঁচারটির কথা না বললেই নয়।

যেমন- শিশু সাহিত্য : ছেলেদের শাহনামা (১৯২৬), তুর্কি উপকথা (১৯৩৯), বেদুইনের দেশ (১৯৫৬), শিয়াল পশ্চিম (১৯৫৬), ছেটদের মহানবী (সা.) (১৯৬১), ইতিহাসের আগে মানুষ (১৯৬১), বাঘ মামা (১৯৬৪), সিন্দাবাদ জাহাজী (১৯৬২), নীল হরিণ (১৯৭৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৮০), ছেটদের নজরল প্রভৃতি।

নাটক : কামাল পাশা (১৯২৭), আনোয়ার পাশা (১৯২৭), মনীষী মজলিস (১৯৩৪), নিজাম ডাকাত (১৯৫০), ঝঁঁ পরিশোধ (১৯৫৫), কাফেলা (১৯৫৬), মায়ের বুলি (১৯৬৮), জেলে ও জীন (১৯৭৫), জঙ্গী বেগম (১৯৫৬)।



জীবন চরিত্র : বাদশা বাবর (১৯২৭), সপ্রাট সালাউদ্দিন (১৯২৭), ছেট থেকে বড় (১৯৫৭), সোহরাব রম্পত্ম (১৯৫৮), হজরত ওমর ফারুক (১৯৬১), ছোটদের নজরুল (১৯৬১), গল্লে ফজলুল হক (১৯৮৩) প্রভৃতি।

গল্পছন্দ : লক্ষ্মীছাড়া (১৯৩৮), সাপুড়ে, আলু বোখরা (১৯৬০), ওস্তাদ (১৯৬৬), মানুষ (১৯৭৬), পাখীর বিদায় (১৯৮২)।

ভ্রমণ সাহিত্য : ইন্দ্রামুলের যাত্রীর পথ (১৯৫৪), নয়াজগতের পথে (১৯৫৭), নয়াচীনে এক চক্র (১৯৬৭)।

প্রবন্ধ : ইসলামের বাণী (১৯৩৯), সোনার শিকল (১৯৩৯), আমাদের শিক্ষা সমস্যার কথা (১৯৪০), আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (১৯৫৪), একটি রূপায়ন স্বপন (১৯৬০), ইলামের মর্ম কথা (১৯৬৩), ছেটদের মিলাদুল্লাহী ইত্যাদি।

সংকলন : ইসলাম সোপান (১৯৬৩)।

স্মৃতি কথা : বাতায়ন (১৯৬৭)।

উপন্যাস: বৌ বেগম (১৯৫৮)।

ইংরেজী সাহিত্য : To my Students (1945), Anecdotes from Islam (1947), A peep into our Rebel Poet (1960), Gleanings in Golden Field

উল্লেখিত সাহিত্যকর্ম ছাড়াও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রন্থের পাঞ্জুলিপি ও অনান্য রচনাবলি বাঁধাই করা খাতায় অপ্রকাশিত রয়েগেছে। প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিপ্রদর্শন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৭৬) লাভ করেন।

প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র সাহিত্যকর্মের বাহিরে আরেকটি জগতের সন্দান পাওয়া যায়; তা হলো আধ্যাত্মিকতা, তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্রই হলো তপস্য। তাই তিনি মুসলিম জাতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য বা কিছু অর্জন করার জন্য তপস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আটুট সংকল্প নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য করে যাওয়াই সৎসার জীবনের তপস্যা, কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি ধর্মীয় জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে সত্যিকার উন্নতি প্রগতি নির্ভর করে এই তপস্যার উপর।'

তপস্যার পথই হলো সংগ্রামের পথ, এ পথ ছেড়ে যারা সহজিয়ার পথ ধরে তারাই মরে (৫)। "যে নদী স্নেত আর তরঙ্গকে উপন্দব মনে করে ত্বর আর শান্ত হয়ে দাঁড়ায়, সে নদী বেশিদিন বাঁচে না।" জীবন থেকে তপস্যা নির্বাসন দিয়ে মুসলিম জাতি মরেছে, তপস্যা ফরিয়ি এনে তাদের বাঁচাতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.) কে পেতে হলে এবং জীবনে কিছু অর্জন করতে হলে তপস্যার বিকল্প নেই এই ছিল তাঁর মৌলিক দর্শন।

এই কীর্তিমান পুরুষটি সকলকে কাঁদিয়ে ২৯ মার্চ, ১৯৭৮ সকাল সাড়ে দশটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র রেখে যাওয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার, মানব উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়ন চিন্তা, আত্মবিকাশের প্রেরণা, জীবন দর্শন ও কর্ম এই আধুনিক যুগে জ্ঞানপিপাসুদের চাহিদাকে পূরণ করবে আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জি:

- প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ আরক গ্রন্থ (২০০৪), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ ফাউন্ডেশন, ধানমন্ডি, ঢাকা পঃ: ৩১
- বাতায়ন (১৯৬৭), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র রচনাবলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পঃ: ৬৮৩
- প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ আরক গ্রন্থ (২০০৪), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ ফাউন্ডেশন, ধানমন্ডি, ঢাকা পঃ: ৩২
- বাতায়ন (১৯৬৭), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র রচনাবলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পঃ: ১০৯
- প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ আরক গ্রন্থ (২০০৪), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ ফাউন্ডেশন, ধানমন্ডি, ঢাকা পঃ: ৪৩
- ইসলামী সোপান (১৯৬৩), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ ও আহচানউল্লাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র তপস্যার দৈন্য
- টু মাই স্টুডেন্টস, অনুবাদক-ইরাল হাসান (২০১৭), ছায়ানীড় প্রকাশনা, ঢাকা
- দ্যুতি, স্মরণিকা (২০০৬), প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ'র স্মরণে, সরকারি সাংদত কলেজ, টাঙ্গাইল

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ।



বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ ও কাম্পীন্দ্রনাথ

আহমদ এহসান উল হানান

এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কম গবেষণা হয়নি। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা যেমন বিশ্বজীৱী, তেমনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য প্রতিভার বিচ্ছুরণ ছিল সর্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত (১৫০তম) জন্মজয়ত্তীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নন্দলাল বসু গ্যালারির একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে নানান রূপে আবিষ্কার করা গেছে রবীন্দ্রনাথকে। জোড়াসাকের ঠাকুরবাড়ি কিংবা শান্তি নিকেতনে বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে কবিগুরু স্বয়ং অভিনয় করেছেন, সে তো আমরা আগেই জেনেছি। আরও কত বিচ্ছিন্নভাবে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনতে পারি! এই যেমন বিজ্ঞাপনচিত্র। আবিষ্কার করা গেছে রবীন্দ্রনাথের ‘মডেল’ প্রতিভাও। ওই সময়ে, ওই সাদা-কালো নির্বাক ছিরচিত্রের যুগে, মূলত প্রিন্ট মিডিয়ায় নানা পণ্য ও সেবা ব্যবসায় ব্যাণ্ড অ্যাসেম্বেডের ছিলেন ঠাকুরবাড়ির জমিদারনন্দন রবি বাবু। সে রকম তো হবারই কথা, সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম বাঙালির সেই তারকা ইমেজ ছিলো বৈকি।

উনবিংশ শেষ কিংবা বিংশ শতকের শুরুর দিককার কথা। আজকের মতো দূর প্রসারী মাধ্যম ইন্টারনেট দুনিয়ার কোলে-কাঁখে চাপেনি। কয়েকটি পত্রিকা আর খবরের কাগজেই বিশুদ্ধর্ণ হতো বাঙালির। তাই বলে ব্যবসার প্রচারণা থাকবে না, তা কী হয়! আর সেকারণেই তখনকার বিজ্ঞাপনদাতারা নিজস্ব ধ্যান ধারণায় জমিদারসুলভ আভিজাত্য আর ভগুহনদয়ের প্রেমিকসভায় মজে থাকা বাঙালিকে হাত করতে তাদের স্ক্রিট রাইটার, মডেল, বৰ্যাণ্ড অ্যাসেম্বেডের সবকিছুর দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাঁধে। বের হলো বেশ কিছু বিজ্ঞাপন। নতুন বই থেকে ইকমিক কুকার, নানা ধরনের পণ্যে ‘মডেল’ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখা স্ক্রিট, আকাঁ ছবি কিংবা ইলাস্ট্রেশন, অটোগ্রাফ বা তাঁর নিজের ছবি এমনকি রবীন্দ্রনাথের কঠ্ঠও। বিজ্ঞাপনের সম্মানে ৬৫-৭০টি নতুন বই ও পত্রিকার সূচনা ও বিশেষ সংখ্যা ঝন্দ হয়েছে কবিগুরুর শুভে”ছা আশীর্বাণীতে। তিনি নিজের হাতের লেখায় বইগুলোর প্রশংসন করেছেন। কিন্তু তাই বলে কেশ তৈল, লেখার কালি, পাগলের ওষুধ, সিনেমা আর মিষ্টির বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ!

বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ

সংবাদপত্র-পত্রিকায় তাঁর ছবি ও লেখায় শোভিত হয়ে বেরিয়েছে গোদরেজ সাবানের বিজ্ঞাপন। তাই ৮-১০ রকম প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে, কুস্তীন চুলের তেল বা দেহ সুগন্ধীর প্রচারেও পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। এসব নানা বিজ্ঞাপনে তাঁর হস্তাক্ষরে প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ হয়ে তা ছাপা হয়েছে দৈনিক পত্র ও সাময়িকীর পাতায়। জলযোগের মিষ্টান্ন নিয়ে মালিকরা গিয়েছেন তাঁর দুয়ারে। পরম আহুদে খেয়ে, লিখে দিয়েছেন জলযোগ গাথা। এই তালিকায় রয়েছে আরও ৩৩টি বিজ্ঞাপন। শ্রীমৃত, বোর্নভিটা ও দাজিলিং চা। চায়ের বিজ্ঞাপনে তিনি যে রচনাটি

ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, সংক্ষেপে সে কবিতাটি:

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।

চা-স্পৃহ চতুর্ল চাতকদল চল' চল' হে

টগ'বগ'-উচ্চল কাথলিতল-জল কল'কল'হে।

এল চীনগগন হতে পূর্বপুনৰ্মোতে শ্যামল রসধর পুঞ্জ॥

শ্রাবণবাসরে রস বাৰ'বাৰ' বাবে, ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে।

মনোৱাগের সমস্যা ছিল ঠাকুরবাড়ির অন্দরেই।

আযুর্বেদ ও হেমিওপ্যাথি ওষুধের প্রচারে তাই দেখা গেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যালস



ও বাটার প্রশংসন লিখেছেন তিনি। বিজ্ঞাপনের ডালিতে রয়েছে আরও চমক। সিনেমা, গ্রামোফোন রেকর্ড, লিপটন চা, ফিলিপস রেডিও, মার্টিন বার্ন, রেল দপ্তর, ইকমিক কুকারসহ কত কিছু! এসব বিজ্ঞাপনের একটা বড় অংশ কবির জীবদ্ধশায় প্রবাসী, বসুমতী, আনন্দবাজার, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, শনিবারের চিঠি, সাধনা, দেশ, বিশ্বভারতীসহ সে সময়ের নানা সংবাদপত্র ও সাময়িকিপত্রে তাঁর সম্মতিতে প্রকাশিত হয়েছে। কতগুলো চাঁদের অলখ টান ছিল রবিঠাকুরের বাহারি বিজ্ঞাপনী কলমে। ওই জিনিসপত্রের বিক্রি-বাটা গ্রাফ কতটা চড়েছিল, সেটা সম্পর্কে জানার জো নেই বিজ্ঞাপনের ১৩৫টি সাদা-কালো ছবি দেখে। সংখ্যা বিচারে তা নিতান্ত কম নয়।



দেশপ্রেমে উজীবিত ভারতবাসীর সামনে স্বদেশি পণ্য-বস্তুর প্রসারের জন্য তিনি এসব করেছিলেন।

কুষ্টলীন সংস্থার হেমেন্দ্রনাথ বসু তাঁর কেশ তেলের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিসহ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতেন তাঁদের কুষ্টলীন পুরস্কার এছে। সেখানে রবীন্দ্র-প্রতিকৃতির নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরসহ লেখা থাকত:

‘কুষ্টলীন তৈল’ আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মায়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল কুষ্টলীন ব্যবহার করিয়া একমাসের মধ্যে তাঁহার ন্তৃতন কেশোদাম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গক্ষে পরিণত হয় না।’ আঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্বিন ১৩৩৪।

‘দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট’ ১৯৪১ সালে অমল হোম সম্পাদিত ‘Tagore memorial’ সংখ্যায় ডেয়ার্কিন কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের ১২৯৫ সালের ৭ আশ্বিন; সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষকে লেখা একটি চিঠি ছাপে:

‘মহাশয়েন্ম/ আপনাদের ডেয়ার্কিন ফ্লুট পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার সুর প্রবল এবং সুমিষ্ট। ইহাতে অল্পের মধ্যে সকল প্রকার সুবিধাই আছে। দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষে আপনাদের এই যন্ত্র যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই যন্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে ইহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইবেন।’ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫৩ বছর পরেও বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়েছে। রাজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর নিজের সম্পাদিত খামখেয়ালী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ১ ও ১৬ জুন ১৯৩৭ সংখ্যায় স্বল্পিত উপন্যাস ‘ভালবাসি’ এর বিজ্ঞাপন ছেপেছেন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও আলোকচিত্রসহ। রবীন্দ্রনাথ তাতে বলেছেন, ‘পড়াদের মনকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার আছে, ‘ভালবাসি’ পড়ে তা উপলব্ধি করেছি— সুলেখা কালি’র বিজ্ঞাপনে রীতিমত রবীন্দ্রনাথের কর্তৃ ব্যবহার করা হয়েছিল (আজকে যাকে আমরা

মডেল রবীন্দ্রনাথ

বেশ কিছু বিজ্ঞাপনচিত্রে তিনি মডেল হয়েছেন নিজেই। যেমন দীপালী পত্রিকার ১ম বর্ষ ২৪ সংখ্যায় (১৯ জুন, ১৯৩৭) ক্যাডব্যারির বোর্নেভিটা কোম্পানির পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের ছবিসহ রবীন্দ্রনাথের সহস্ত্রে ‘বোর্নেভিটা সেবনে উপকার পাইয়াছি’ লেখা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞাপনে মডেল হতে রাজি হওয়াটা ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। মূলত স্বদেশি আন্দোলনের সে যুগে

GODREJ'S VEGETABLE TOILET SOAP



Says Dr. Rabindra Nath Tagore: "I know of no foreign soaps better than Godrej's and I well make a point of using Godrej's Soap."

www.OldIndianAds.com

FACTORY:

DELISLE ROAD

BOMBAY

Sole Agents:

NADIRSHAW, PRINTER & CO.

Bombay, Calcutta, Lahore, Madras and Karachi

বিজ্ঞাপনের পরিভাষায় বলি জিসেল)। সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, ‘সুলেখা কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।’ ভাবলে অবাক হই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের চেয়ে কতটা আধুনিক ছিলেন। ছিলেন উত্তর আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ জীবিতকালে বিজ্ঞাপনে নানাভাবে হাজির হয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, মৃত্যুর পরও তাঁর ভাষ্য, বাণী, প্রতিকৃতি, হস্তাক্ষর, স্বাক্ষর ব্যবহার হয়েছে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপনে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জগতসভার দায়িত্বভার নিয়ে তাঁর অপরিসীম সৃষ্টি কর্মে ব্যস্ত এক মহামানব। সে ব্যস্ততা এত ব্যাপক আর বিচিত্র যে সেখানে মন্তিক থাকে হাজারো চিন্তার জটাজালে আকীর্ণ, জীবনের শেষ মুহূর্তের দিব্যজ্ঞানে যে সত্যটি তিনি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে বলে উঠেছিলেন— তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী। কিন্তু এই বিচিত্রের সাধনার এই বিশাল কর্মায়ের ব্যস্ত থেকে বহুমুখীন বহুমাত্রিকতা অর্জন একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো অতিমানবের পক্ষেই সম্ভব। তাই আমাদের মনে প্রতিনিয়ত অনুরণন হয় তাঁর উদ্বৃত্তি ‘বিশ্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার প্রাণ।’

কাজী নজরুল

জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক কিছুই হয়তো আমরা জানি না। মাত্র কয়েক বছরের কাব্য সাধনায় যে কবি বাংলা সাহিত্যে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্র ও অনেক কিছুই ছিল ব্যতিক্রমী। কবিতায় তাঁর যে সত্ত্ব দেখতে পাই, এর সাথে অনেক পার্থক্য ছিল তাঁর খেয়াল খুশির। রবীন্দ্রনাথ যখন বিজ্ঞাপন শিল্পে ও বাণিজ্যে সর্বব্যাপী প্রসারিত নজরুলও তখন বহুমাত্রিকতায় বিচ্ছুরিত। তবে বিজ্ঞাপন জগতে নজরুল নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবেই।

‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় নজরুল যখন লিখতেন।
সেকালে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল আকাশহোঁয়া।
কলকাতার এক বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী কবি নজরুলের
কাছে এসে বায়না ধরল একটি বিজ্ঞাপন লিখে দিতে।
কোম্পানিটির নাম ‘ডোয়াকিন এন্ড সন্স’ তাদের নির্মিত
হারমোনিয়ামের জন্য কবি নজরুল তখনই কাগজ
কলম নিয়ে বসে লিখে ফেললেন এই বিজ্ঞাপনটি—

কি চান? ভাল হারমোনী?
কাজ কি গিয়ে-জামানী?
আসুন দেখুন এই খানে,
যেই সুর যেই গানে,
গান না কেন, দিব্যি তাই,
কিন্নি কিন, ডোয়ার কিন...



বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ামের ব্যবসা করত, কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় তখন আরেকটি কোম্পানি ছিল, ‘বাহদুর কোম্পানি’। পত্রিকায় ডোয়াকিন কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখে তারাও ছুটে এল কবি নজরুলের কাছে। তাদেরও দাবি, লিখে দিতে হবে এমন একটি বিজ্ঞাপনী বার্তা। কী আর করাঃ কবি আবারও অনুরোধের চেকি গিলেন, লিখলেন এই জিসেলটি—

মিষ্টি বাহা বাহা সুরে, চান তো কিনুন ‘বাহদুর’
দুদিন পর বলবেনা কেউ- ‘দূর দূর’,
যতই বাজান ততই মধুর সুর!
করতে চান কি মনের প্রাণের আহা দূর?
একটি বার তাই দেখুন তবে ‘বাহদুর’,
যেমন মোহন দেখতে তেমনি শিরীন ভরাট,
বাহ সুর, চিনুন, কিনুন বাহদুর।

এরপর কয়েক মাস ধরে একই পত্রিকায় এ দুটো বিজ্ঞাপন ক্রমাগত ছাপা হয়েছিল এক সাথে। কোম্পানি ব্যবসা করেছিল দেদারসে। ঘোকড়া চুলে বাবরি দোলানো মহান পুরুষ নজরুল পরে মাথার চুলের জন্যও লিখেছিলেন একটি সুন্দর বিজ্ঞাপনী স্ক্রিপ্ট। খেয়ালী নজরুল থেকে এভাবে কতো ব্যক্তি ও কোম্পানি যে উপকৃত হয়েছে, তার হিসেবও বেশুমার।

তথ্যসূত্র: দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৪

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ।



সাঁদত আলী খান পন্নী উনিশ শতকের এক খ্যাতিমান জমিদার সুলায়মান কবীর

অবিভক্ত বাংলার খ্যাতিমান জমিদার পরিবারগুলোর মধ্যে করটিয়ার পন্নী পরিবারের অন্যতম। মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে ১৬০১-০২ সালে এই পরিবারের জমিদারির সূচনা হয়। সাঁদত খান পন্নী ছিলেন সুবিখ্যাত এই জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের অন্যতম সেরা প্রত্ননির্দেশন আটিয়া জামে মসজিদটি (১৬০৯) তিনিই নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, প্রাচীনকাল থেকেই আটিয়া ছিল একটি উল্লেখযোগ্য শহর ও নদী বন্দর। (আরবি-ফারসি বর্ণমালায় 'ট'-এর অনুরূপ বর্ণ না থাকায় মুসলিম শাসনামালে আটিয়া শব্দটি আতিয়াতে রূপান্তরিত হয়।) আটিয়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই পন্নীদের জমিদারির সূচনা হয় বলে তাঁরা আটিয়ার জমিদার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আটিয়ার জমিদার হিসেবে সুখ্যাতি পেলেও পন্নীদের স্থায়ী বাসস্থান কখনোই আটিয়াতে ছিল না। সাঁদত খান পন্নীর আমলে অথবা পরবর্তীকালে বর্তমান মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই গ্রামে পন্নীদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মিত হয়।

সাঁদত আলী খান পন্নী ছিলেন পন্নী পরিবারের নবম পুরুষ। ১৮১৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল ফয়েজ আলী খান পন্নী। মায়ের নাম ছিল রাইজুরেছা। সমকালীন রীতি অনুযায়ী তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। তাঁর নামের আগে মুসিং পদবির ব্যবহার দেখে স্পষ্টতই ধারণা করা যায় যে তিনি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবত শৈশবেই সাঁদত আলীর মায়ের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পিতা আবার বিয়ে করেন। তাঁর বিমাতার নাম ছিল শমসেরেনেছা। তাঁর গর্ভজাত একটি পুত্র সন্তান ছিল।

সাঁদত আলীর কিশোর বা তরুণ বয়সে তাঁর পিতা ফয়েজ আলীর মৃত্যু হলে পন্নী পরিবারে জমিদারি নিয়ে তীব্র বিবাদ দেখা দেয়। উত্তরাধিকার আইন ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জমিদারি সাঁদত আলীর প্রাপ্ত হলেও বিমাতা শমসেরেনেছাই যাবতীয় সম্পত্তি নিজের ভোগদখলে রাখেন। পিতামাতার্হাইন সাঁদত আলীর অপরিণত বয়সের সুযোগে বিমাতা তাঁকে বধিত করে নিজ গর্ভজাত পুত্রকে জমিদারি পাইয়ে দিতে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। পারিবারিক বিবাদ ক্রমে তীব্র হয় এবং মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। এ অবস্থায় নিজের নিরাপত্তা কর্তৃত চিন্তা করে সাঁদত আলী বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অবশ্যে তিনি আতীয়-স্জননের পরামর্শে ঢাকার খাজা (পরবর্তীকালে নবাব) পরিবারের প্রধান খাজা আলিমুল্লাহ বা আলিমিয়ার সহায়তায় জমিদারিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তবে চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত হিস্যা প্রদান না করায় আলিমিয়া সাঁদত আলীর বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করেন এবং মামলায় ডিক্রি পান। অবশ্যে সাঁদত আলী আপস-মীমাংসা করতে বাধ্য হন এবং ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮-৩৯ খ্রি.) খাজা পরিবারকে জমিদারি স্বত্ত্বের সাত আনা অংশ প্রদান করেন। (অবশ্য স্ত্রী জমরংদুরেসা খানমের মালিকানাধীন 'কাবিন মহল' এবং পারিবারিক চাষাবাদের জমি বা খামার জমি থেকে খাজা পরিবার কোন অংশ পায়নি।) এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অতীব কঠিন শর্তের উভ চুক্তিপত্রে ব্যবসায়ী থেকে জমিদারে রূপান্তরিত খাজা পরিবারের ব্যবসায়ী-মহাজন মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সাঁদত আলীর চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি সমর্থন করা যায় না এবং সজ্জন হিসেবে পরিচিত তাঁর একরূপ আচরণের নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

জমিদারি উদ্বারের পর বিমাতার সাথে মনোমালিন্য কিংবা অন্য কোনো কারণে সাঁদত আলী তাঁর বাসস্থান গোড়াই মন্ডেননগর থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১২৬১ বঙ্গাব্দে (১৮৫৪ খ্রি.) লৌহজং নদীর তীরে অবস্থিত করটিয়াতে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন। জমিদার সাঁদত আলী খান পন্নীর সংস্কর্ষে শাস্ত-নিরিবিলি গ্রাম করটিয়া কর্মচর্ষ্ণল হতে শুরু করে। তাঁর প্রচেষ্টা ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশের জন্য নানা শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান করটিয়ায় এসে বসবাস করতে থাকে। এখানে হাট-বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমায়ে এটি একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। অল্পকালের মধ্যেই করটিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসেবে পরিচিতি পায়।

ইংরেজ শাসনের প্রভাবে বাংলার সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। এ কারণে উনিশ শতকে কোলকাতাসহ শহরবাসী, কুলীন ও উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ, মদপান, অশ্লীল নাচ-গান, বেশ্যাগমন, রক্ষিতা পোষণ প্রত্যক্ষ অনাচার অনেক বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশী মুসলিম সমাজসহ বাংলার জনজীবনে এর কুপ্রভাব বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে মুসলিম উচ্চবিত্ত ও জমিদারদের

মধ্যে কিছু অনাচার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এ দুঃয়ের সম্মিলিত প্রভাবে সমকালীন মুসলিম উচ্চবিভিন্ন ও জমিদারদের মধ্যে নানা অনাচার বা চারিত্রিক দোষের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এসবের মধ্যে বহুবিবাহ, বাঁদি বা উপপত্নী পোষণ, অশীল নাচ-গান উপভোগ বা বাইজি (natch girl) প্রথা, মদপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলোকে অনেক সময় এককথায় হারেম প্রথা (Harem System) বলা হতো। এই হারেম প্রথা ছিল মুসলিম জমিদারিসমূহের পতনের প্রধান কারণ। মুসিং সাঁদত আলী খান পন্থী উক্ত অনাচার বা দোষ-ক্ষণটি থেকে মুক্ত ছিলেন। একমাত্র স্ত্রী জমরংদুল্লেসা খানমের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন এবং সৎ চরিত্রের প্রশংসা করে সেকালের বিখ্যাত ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় লেখা হয় :

“সাঁদত আলী খাঁ অতি মিতভাসী, মিতাচারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। আয়ে আঘাতিশয় ও বাহ্যিক্যয়ে বিমুখতা ইহার চিরদিনই ছিল। বিলাস ও জাঁকজমক কাহাকে বলে জানিতেন না। সাধারণত বড় মানুষ জমিদার—বিশেষত মুসলমান বড় মানুষদিগের বেরুপ বাসনাদি থাকে, ইহার ঘোবনকালেও সেরূপ ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না।”

‘অতি ব্যয়কৃষ্ট’ সাঁদত আলী আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন এবং অনেক সময় প্রজাদের দেয়া উপহার বিক্রি করে ‘পয়সা সঞ্চয়’ করতেন। সমকালীন জমিদারদের মতো তিনি ঝণঝন্ত ছিলেন না। বরং ‘বহুসংখ্য লোকে ইহার নিকট ঝণার্হী হইয়া যাইতেন।’ তিনি পৈত্রিক জমিদারির সুষ্ঠু পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন তালুক ক্রয়ের মাধ্যমে বৃহত্তর জমিদারি গড়ে তুলেন। তাঁর সম্পত্তির মোট বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকায় উন্নীত হয় এবং সমকালীন ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার ভাষায় তিনি ‘পূর্ব বাঙালার মধ্যে একজন প্রধান গণনীয় জমিদার’-এ পরিণত হন।

অতিশয় ব্যয়কৃষ্টতা বা কার্পণ্যের জন্য সমকালীন ভদ্রসমাজে নিন্দনীয় হলেও সাঁদত আলী খান পন্থী প্রজাসাধারণের মঙ্গল তথা জনসেবার জন্য অর্থব্যয়ে কখনো দ্বিধাবিত হননি। তাঁর মানব কল্যাণের একটি ভূলঙ্ঘ দৃষ্টিত হলো তাঁর তৌলিয়তনামা বা দানপত্র। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের (১৮৭০ খ্রি.) ৯ পৌষ তারিখে স্ত্রী জমরংদুল্লেসার (বা জমরতন্মো) সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত তৌলিয়তনামায় তিনি তাঁদের সমস্ত সম্পত্তিকে দুঁভাগ করে একভাগ পারিবারিক প্রয়োজনে ও অপরভাগ ধর্মীয় ও দাতব্যকাজে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। অসহায় ও নিঃস্ব প্রজাসাধারণের সুচিকিৎসার কথা চিন্তা করে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি করাটিয়াতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। একমাত্র পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্থীর নামানুসারে তিনি এর নাম দেন মাহমুদিয়া দাতব্য হাসপাতাল। তাঁর সময়েই ১২৭৭ বঙ্গাব্দে করাটিয়া জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

সমকালীন অঙ্ককারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে সাঁদত আলী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি করাটিয়াতে একটি মাইনর স্কুল (নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়) স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি নিজ বাড়িতে একটি আরবি-ফারসি মাদ্রাসা বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং এতে নিজে শিক্ষকতার দায়িত্ব প্রদান করেন। জানা যায়, তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে তিনিই প্রথম করাটিয়াতে একটি প্রেস বা ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে কওম নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সম্ভবত জমিদারির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মুদ্রণের প্রয়োজনেই এই ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বা বিবরণ পাওয়া যায় না।

পন্থী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবি নঙ্গমুদ্দীন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আল-কুরআন-এর বঙ্গনুবাদ এবং আখবারে এসলামীয়া পত্রিকা সম্পাদনা, জুব্দাতুল মসায়েল-সহ বহু ধর্মগ্রন্থ রচনা করে উনিশ শতকের শেষার্ধে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সাঁদত আলীর



আহ্বানে সাড়া দিয়েই তিনি প্রথম করটিয়াতে আসেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চা ও ধর্মপ্রচারে আত্মনিরোগ করেন। কৃতজ্ঞ নঙ্গমুদ্দীন সাঁদত আলীর মৃত্যু-পরবর্তীকালে প্রকাশিত এনসাফ হাতু রচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রশংসায় লিখেন:

“টাঙ্গাইল মহকুমা বিচে আটিয়া পরগণা।
বড় নেক জমিদার ছিল একজনা ॥
ছাঁদত আলী খাঁ নাম এদেশে বিখ্যাত।
বড় নেককার ছিল, বড় নেকজাত ॥

নিম্নত পল্লীতে বাস করলেও সাঁদত আলী খান পন্থী সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং দেশের বিশিষ্টজনদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘পূর্ববাঙালা ভূম্যধিকারি সভা’র তিনি একজন্য অঞ্চলগণ্য ও নেতৃত্বানীয় সদস্য ছিলেন। বাংলার লে. গভর্নর অ্যাশলে ইডেন (১৮৭৭-৮২) কর্তৃক গঠিত ‘রেন্ট-ল’ কমিশন (Rent-law Commission) খাজনা আদায়ের বিধানাবলি সংস্কারের লক্ষ্যে যে প্রস্তাব পেশ করে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য ঐ ‘ভূম্যধিকারী সভা’র এক অধিবেশন ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ২৮ অগ্রহায়ণ (১২ ডিসেম্বর ১৮৮০) ঢাকার নর্থকুক হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ‘রেন্ট-ল’ কমিশনের প্রস্তাবের বিপক্ষে সাঁদত আলী প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং অধিবেশনে বিশিষ্ট জমিদারদের আলোচনা শেষে ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা এবং দেশের জমিদার সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। সাঁদত আলীর সময়েই ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এতে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে পরোক্ষ কিছু সূত্রের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, ঐ মহাবিদ্রোহে তিনি বিপুরীদের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন।

জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও কৈশোরেই সাঁদত আলী ভাগ্য-বিড়ম্বনার শিকার হন এবং বিমাতার সাথে বিবাদে অপরিসীম কষ্ট ও ধৈর্যের মাধ্যমে জমিদারির অধিকার অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি নতুন নতুন তালুক কিনে জমিদারির আকার বৃদ্ধি করেন। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা ছাড়াও ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলায়ও তাঁর জমিদারি বিস্তৃত হয়। অনন্দিকে গোড়াই থেকে করটিয়াতে বাসস্থান স্থানান্তরের পর করটিয়াকে তিনি একটি সমৃদ্ধ জনপদে রূপান্তর করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রায় বিলীয়মান পন্থী পরিবার জেগে উঠে এবং করটিয়াকে কেন্দ্র করে এই পরিবারের ব্যাপক সমৃদ্ধি ও শ্রীরূপি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর (ডিসেম্বর, ১৮৮০) পর তাঁর পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্থী এবং বিশেষত নাতি ওয়াজেদ আলী খান পন্থী ওরফে চাঁদমিয়ার আমলে পন্থী পরিবার সমৃদ্ধি ও খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। আধুনিককালে পন্থী পরিবারের এই জাগরণের পথিকৃত ছিলেন সাঁদত আলী খান পন্থী। এজন্য নির্দিষ্টায় তাঁকে আধুনিক পন্থী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বলাবাহ্ল্য, সাঁদত কলেজ তাঁরই নামে তাঁর সুযোগ্য নাতি ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্যসূত্র:

১. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ পৌষ, ১২৮৭, ৯ জানুয়ারি ১৮৮১
২. তোফায়েল আহমদ (সম্পাদক), আটিয়ার চাঁদ, করটিয়া, (টাঙ্গাইল), ১৯৯১
৩. মীর সোহরাব আলী, ‘করটিয়ার সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধন’, মালঞ্চ, সরকারি সাঁদত কলেজ ম্যাগাজিন, ১৯৮৬-৮৭
৪. ড. এম এ রাইম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭), দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ: মোহাম্মদ
৫. আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাহিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০২১
৬. *The Moslem Chronicle*, 21 March 1895 & 16 April 1904 (Supplement)
৭. ওয়াজেদ আলী খান পন্থীর ১৯২৬ সালের ওয়াকফ দলিল
৮. Syed Mohammed Taifoor, ‘Wajed Ali Khan Panni’, *The Pakistan Observer*, 11 October, 1959
৯. আবদুল হালীম খাঁ, আল কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক মৌলভী মোহাম্মদ নঙ্গমুদ্দীন, মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮
১০. Dr. Mofakkhar Hussain Khan, *The Holy Qur'an in South Asia*, Dhaka, 2001
১১. লাভলীমাহম রায় চৌধুরী, ‘খেতাবের রাজনীতি’, দেশ, ৫০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৩ আগস্ট ১৯৮৩
১২. সুলায়মান কবীর, বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্থী, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০২০
১৩. সাঁদত কলেজের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান মীর সোহরাব আলী এবং পন্থী পরিবারের তথ্যাভিন্ন সদস্য জাফর রাকিব খান পন্থী (আদনান)-এর সাক্ষাৎকার।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ।



মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে মো. মোশারফ হোসেন

বর্তমান বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও অপরিহার্য। এ কারণেই ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে অর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত মানবসম্পদ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দক্ষ মানবসম্পদ ব্যতীত গতিশীল ও টেকসই উন্নয়ন সম্বন্ধে নয়। বর্তমান বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব তাই নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এ কারণে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (MDGs) মানবকল্যাণ এবং দারিদ্র্যবিমোচনকে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে দিয়েছে। সুস্থান্ত্রের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানবসম্পদকে আবার মানব মূলধন (Human Capital) হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সুস্থান্ত্র, সবল ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সম্মত মানুষই অর্থনীতিতে মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

সাধারণ অর্থে কর্মক্ষম মানুষ অথবা শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলা যায়। কিন্তু অর্থনীতিতে মানবসম্পদ ধারণার সাথে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা জড়িত। কাজেই একটি দেশের উৎপাদনশীল ও দক্ষ শ্রমশক্তি বা জনশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়। একটি দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্ত্রগত সম্পদ বলা হয় বিধায় তার প্রেক্ষিতে শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদ B.R Kiker মনে করেন— নিম্নোক্ত কারণে কর্মক্ষম মানুষকে সম্পদ হিসেবে নির্দেশ করা যায়।

মানবসম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। মানবসম্পদ ছাড়া উন্নয়নের অপরাপর উপাদান বিকল ও অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে অধিকতর দক্ষ ও বেশি উৎপাদনশীল করা যাবে। কাজেই কর্মক্ষম জনশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সম্মত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মানবসম্পদ উন্নয়ন।

অর্থনীতিবিদ জে.ডি. লেথি বলেন, ‘মানবসম্পদ উন্নয়ন যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে তা মানুষের ভিতরে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক, কারিগরি, উদ্যোগী এমনকি নৈতিক সামর্থ্যগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার বোঝায়— এটি নতুন নতুন সামর্থ্য সৃষ্টি বোঝায়।’

অর্থনীতিবিদ Gunar Myrdal মানবসম্পদ উন্নয়নের আটটি অপরিহার্য উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. খাদ্য ও পুষ্টি;
২. বস্ত্র;
৩. বাসস্থান ও তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা;
৪. শিক্ষা;
৫. স্বাস্থ্য সুবিধা;
৬. জনসংযোগ মাধ্যম;
৭. পরিবহন এবং
৮. শক্তি ভোগ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অর্থনৈতির বিভিন্ন খাতের ক্রম উন্নয়ন ঘটে। আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধি যার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের সাথে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরপক্ষে মানবসম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। মানুষকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে অধিকতর দক্ষ ও অধিক উৎপাদনশীল করা যায়। কাজেই কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান করে যে কোনো ক্ষেত্রে শ্রমের প্রাণিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। কাজেই মানবসম্পদ উন্নয়ন দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করা যায়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

- জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর :** জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত করা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষের জন্য উপযুক্ত কাজ নিশ্চিত করা, তাদের কাজে উৎসাহিত করা এবং এ লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোগে তৈরি, প্রশিক্ষণ প্রদান, খণ্ড বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হলে তা সম্পদ। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি দক্ষ হয়ে জন্মায় না। জন্মের পর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষকে দক্ষ করে গতে তুলতে হয়। এ কারণে রাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষ করে জনশক্তি গড়ে তোলে। আর দক্ষ জনশক্তির উৎপাদনশীলতা অধিক। অধিক উৎপাদনশীলতা একটি অর্থনৈতির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।
- দক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি :** মানবসম্পদ উন্নয়নের ভেতর দিয়ে দক্ষ শ্রমিক যেমন তৈরি করা যায় তেমনি প্রযুক্তিবিদও তৈরি করা যায়। আর দক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদ দ্বারা প্রাণিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির প্রাণ্ট প্রাণিক উৎপাদন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে যেমন বাড়িয়ে দেয় তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে দ্রুত করে।
- মোট উৎপাদন বৃদ্ধি :** মানবসম্পদ উন্নয়নের ভেতর দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মোট উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা যায়। আর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে নির্দিষ্ট সময়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন বাড়ে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটে। অর্থাৎ মানবসম্পদ উন্নয়ন দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভাবিত হয়।
- আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ভোক্তার আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন দ্বারা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। আর দক্ষ জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে দ্রুত করে। এর ফলে জনগণের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** দক্ষ মানবসম্পদ দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের করা সম্ভব। অদক্ষ জনশক্তির তুলনায় দক্ষ জনশক্তির প্রাণিক উৎপাদন অধিক। এর ফলে দক্ষ জনশক্তির আয়ের পরিমাণও অধিক। অধিক আয় দ্বারা জীবনযাত্রার মানকে উন্নয়ন করা সম্ভব। অতএব বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে।
- সংস্থায় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** মানবসম্পদ উন্নয়ন দ্বারা দেশের মোট জনশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবার জনগণের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সংস্থায় তথা বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাণ যেমন বাড়ে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নও দ্রুত হয়।
- জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি :** মানবসম্পদ উন্নয়ন দ্বারা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারে তবে জনশক্তি রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব হয়। আর অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করে। বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২৬% বেড়েছে।



৮. অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে দ্রুত করার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। আর অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হলে রাষ্ট্রাঘাট, বাঁধ, বৈদ্যুতিক প্রকল্প, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণের প্রয়োজন হয়। আর এগুলো নির্মাণ করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। কাজেই বলা যায়— মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।
৯. খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। খাদ্য আমদানি করার জন্য এসব দেশগুলোকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। অথচ কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষির সাথে জড়িত লোকদের উন্নত প্রযুক্তি ও উপকৌশল বীজ এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।
১০. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা : অধ্যাপক রাগনার নার্কস-এর মতে, ‘A country is poor, because it is poor.’ জনগণের মাথাপিছু আয় কম হলে উৎপাদনশীলতাও কমে যায় আর উৎপাদনশীলতা কম হলে সেটা সরাসরি কাজের বাজারকেও সঙ্কুচিত করে দেয়। যার ফলে বেকারত্ব দেখা যায় এবং এটাই চক্রটাকেই বলা হয় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোকে দরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের ভেতর দিয়ে দুষ্টচক্রকে ভাঙা সম্ভব। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাবে।



সুতরাং দেখা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ও সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ।





পন্নী পরিবারের যাঁদের নামে করটিয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মো. ছোলায়মান হোসেন

মুঘল আমলে পন্নী পরিবার প্রজাসেবকের ভূমিকায় বিভিন্ন জগতিক কাজে আত্মিয়োগ করেছিলেন। প্রজাদের কল্যাণে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা-বিকাশ, সমাজসেবা ও মানবপ্রেম, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু নিজ জমিদারি এলাকাতেই অবিস্মরণীয় হয়নি; সারা বাংলায়ও আদর্শ জনসেবকের পরিচিতি এনে দিয়েছে। প্রামাণ্য তথ্যে দেখা যায়, সাঁদত আলী খান পন্নী ও তাঁর পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপনে ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। পন্নী পরিবার করটিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। আমাদের এ আলোচনা পন্নী পরিবারের যাঁদের নামে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— তাঁদের নিয়ে।

সাঁদত আলী খান পন্নী / সাঁদত কলেজ : সাঁদত আলী খান পন্নী ছিলেন ফয়েজ আলী খান ও রাইজুন্নেসার পুত্র। পিতা ফয়েজ আলী খানের মৃত্যুর পর বিমাতা শমসেরুন্নেসার সাথে জমিদারি নিয়ে তীব্র বিবাদ দেখা দেয়। পিতামাতাহীন সাঁদত আলীর অপরিণত বয়সের সুযোগে বিমাতা তাঁকে বঞ্চিত করে নিজ গর্ভজাত পুত্রকে জমিদারি পাইয়ে দিতে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। পারিবারিক এ বিবাদ শেষপর্যন্ত মামলা-মোকাদ্দমায় গড়ায়। সাঁদত আলী খান আতীয়-স্বজনের পরামর্শে ঢাকার খাজা পরিবারের সহায়তায় জমিদারিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদারি ফিরে পাবার পর নিজ বাসস্থান গোড়াই থেকে করটিয়াতে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। তাঁর সংস্পর্শে শাস্ত্ৰ-নিরিবিলি গ্রাম করটিয়া কর্মচক্রে হতে শুরু করে। এখানে নানা শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান বসবাস করতে থাকে। হাট-বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধীরেধীরে করটিয়া একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে।

সাঁদত আলী খান পন্নী ব্যবসচেতন জমিদার ছিলেন। অনেক সময় প্রজাদের দেয়া উপহার বিক্রি করে অর্থ সম্পত্তি করতেন এবং সংগ্রহ করে সম্পত্তি ক্রয় করে বৃহৎ জমিদারি গড়ে তোলেন। এতে তিনি পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জমিদার হয়ে উঠেন। সাঁদত আলী খান পন্নী অর্জিত সম্পত্তি হতে প্রজাদের মঙ্গল ও জনসেবায় ব্যয় করেন। তিনি ১২৭৭ বঙ্গাব্দে একটি দানপত্র করেন স্বীকৃত জমরুন্নেসার সাথে। তাঁদের সম্পত্তি দুভাগ করে একভাগ পারিবারিক প্রয়োজনে অন্যভাগ ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। অসহায় ও নিঃসেবের খাওয়ানের জন্য খোলেন লঙ্ঘনস্থানা এবং প্রজাদের চিকিৎসার জন্য করটিয়াতে ‘মাহমুদিয়া দাতব্য চিকিৎসালায়’ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ই করটিয়া জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। শিক্ষা সংস্কৃতিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। করটিয়াতে একটি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া নিজের বাড়িতে মাদ্রাসা বা মক্কব প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে শিক্ষকতা করতেন তিনি নিজে। করটিয়াতে তিনি একটি প্রেস স্থাপন করেন (যেটি তৎকালীন ময়মনসিংহে প্রথম)। এ ছাপাখানা থেকে ‘কওম’ নামে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

মহাত্মা প্রজাহিতৈষী জমিদার সাঁদত আলী খান পন্নীর নামেই প্রতিষ্ঠিত হয় বপের আলীগড় খ্যাত সাঁদত কলেজ। প্রতিষ্ঠা করেন ‘আটিয়ার চাঁদ’ খ্যাত জনদরদী, শিক্ষানুরাগী, বৃত্তিশিল্পী আনন্দলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মৌলবি ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। দাদার নামে তিনি কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে কলেজটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন প্রিসিপাল ইবরাহীম খাঁ। তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাঁদত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব হিসেবে পৌঁছে দেন। কলেজটি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ডিপ্রি কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এ কলেজে অনার্স ও ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কলেজটি জাতীয়করণ হয়। বর্তমানে সরকারি সাঁদত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল দেশের অন্যতম বৃহৎ স্নাতকোত্তর কলেজ। পাসকোর্স ছাড়াও বর্তমানে কলেজটিতে ১৮টি বিষয়ে অনার্স এবং ১৫ টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার। বৃহৎ পরিসরের এ কলেজটি জমির পরিমাণ প্রায় ৩৭.০৭ একর।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী/ এইচ এম ইনসিটিউশন : সাঁদত আলী খান পন্নীর মৃত্যুর পর জমিদারির দায়িত্ব পান তাঁর পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী। কিন্তু হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী অন্ধ হওয়ায় জমিদারির দায়িত্ব পান তাঁর মা জমরুন্নেসা খানম। মাহমুদ আলী খান পন্নী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দশ বছর বয়সে দৃষ্টি শক্তি হারান। অল্প বয়সেই তিনি কোরআনে হাফেজ হন। ফারসি ও উর্দু ভাষাতেও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সাধনা ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে তিনি কামেল ও ওলিঙ্গপে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন।

পিতা সাঁদত আলী খান পন্নী যে প্রেস স্থাপন করেন পরবর্তী সময়ে হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ‘মাহমুদিয়া প্রেস’ নামে স্টোটি স্থাপন করেন।

এ প্রেস থেকে ‘আখবারে এসলামিয়া’
পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো।
মাহমুদ আলী খান পন্নীর অন্যান্য
সাফল্য হচ্ছে মৌলবি নঙ্গমুদিনের
সাথে ঘোথ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায়
‘আল কোরআন’ অনুবাদ। এ ছাড়াও
তিনি ‘আঙ্গুমানে মঙ্গল ইসলাম’
প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন।
সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন এ
সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

মাহমুদ আলী খান পন্নী শিক্ষা প্রসারে
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পিতা
সাঁদত আলী খান পন্নী যে মাইনর স্কুল
প্রতিষ্ঠা করনে মাহমুদ আলী খান পন্নী
১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটিকে মধ্য
ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নিত করেন।
১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াজেদ আলী খান
পন্নী করটিয়ায় ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার নামানুসারে

নামকরণ করেন মাহমুদিয়া অ্যাঙ্গো-ওরিয়েটাল হাইস্কুল। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে করটিয়া হাইস্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।
খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে করটিয়া জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৫ সালে ইব্রাহীম খাঁ এ স্কুলের
দায়িত্ব নেন এবং ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পুনরায় স্কুল চালু হয়। তখন থেকে স্কুলটির নতুন নামকরণ হয় ‘হাফেজ মাহমুদ আলী ইনসিটিউশন’
(এইচ এম ইনসিটিউশন)। বর্তমানে স্কুলটিতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরও চালু আছে।

রোকেয়া খানম/রোকেয়া ফাজিল মাদ্রাসা : ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর স্ত্রী ফাতেমা খানমের মৃত্যু হয়। স্ত্রীর অকাল
মৃত্যুতে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতায় গমন করেন। সেখানে
রোকেয়া খানম নামে একজন মহিলা চিকিৎসক মতান্ত্রে নার্স বা সেবিকার উপর তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব ন্যায় হয়। মহিলার গুণে তিনি মুন্দু
হন এবং তাকে বিয়ে করেন। রোকেয়া খানমের নামে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজ বাড়িতে ‘রোকেয়া মহল’ নামে একটি
ভবন নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে দৃশ্যমান করটিয়া জমিদার বাড়িতে। রোকেয়া খানম ছিলেন নিঃসন্তান। সাঁদত আলী খান পন্নী নিজ
বাড়িতে যে মাদ্রাসা স্থাপন করেন- হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী এটিকে মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তর করেন। ওয়াজেদ আলী খান
পন্নী ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসাটি পুনর্গঠিত করেন এবং স্ত্রী রোকেয়া খানমের নামে নামকরণ করেন ‘রোকেয়া হাই মাদ্রাসা’। পরবর্তীতে
মাদ্রাসার আরও অগ্রগতি সাধিত হয়। বর্তমানে মাদ্রাসাটিতে আলিম ও ফাজিল কোর্স চালু হয়। মাদ্রাসাটির বর্তমান নাম ‘রোকেয়া ফাজিল
মাদ্রাসা’।

আবেদা খানম/আবেদা খানম বালিকা বিদ্যালয় : দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর একমাত্র সন্তান ছিলেন মসউদ আলী খান পন্নী ওরফে
নবাব মিশ্র। তাঁর স্ত্রীর নাম আবেদা খানম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, দেলদুয়ারের জমিদার আবুল করাম গফনবীর কন্যা।
আবেদা খানমের নামে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে করটিয়াতে আবেদা খানম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁদত কলেজ, এইচ এম ইনসিটিউশন
ও রোকেয়া হাই মাদ্রাসার উৎসাহী শিক্ষকবৃন্দের সক্রিয় উদ্যোগ ও মসউদ আলী খান পন্নীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলে
নারী শিক্ষা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটিতে কলেজ শাখা চালু হয়। বর্তমান নাম আবেদা খানম স্কুল
এন্ড কলেজ।

তথ্যসূত্র :

ড. ওয়াকিল আহমেদ- উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা;

সুলায়মান কবীর- বাংলায় মুসলমান জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (সুবর্ণ প্রকাশনি, ঢাকা, ২০২০);

মৌলবি ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া) এর ৮১ তম মৃত্যুবর্ষ উদ্যাপন -২০১৭ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা- জ্যোতির্ময়; প্রকাশনায় সরকারি সাঁদত কলেজ,
করটিয়া, টাঙ্গাইল;

চিচার্স ডাইরেক্টরি- ২০২১; প্রকাশনায়, সরকারি সাঁদত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।



করটিয়া জমিদার বাড়ি



কালের আর্তে সংখ্যা

মো. মুক্তার হোসাইন

অতীত ইতিহাস বলে আজকের শিশু মেটা বুবো নেয় কয়েক বছরের পরিগত বুদ্ধিতে মানব সভ্যতার জন্য সেই সময়টা লেগেছিল কয়েক হাজার বছর। ছোট শিশু যখন কথা বলতে শিখে তখন আমরা তাকে গণনা করতে শিখাই। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছি সেই গণনায় ১ থেকে শুরু করা হয় কিন্তু ০ (শূন্য) থেকে নয়। যাই হোক আমার আজকের আলোচনার বিষয় সংখ্যার ইতিহাস। আজকের আধুনিক যুগের সংখ্যা কিভাবে আসলো? মানব সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে সংখ্যার ধারণারও বিবর্তন হয়েছে। সংখ্যা সর্বপ্রথম কোন সভ্যতা আবিষ্কার করেছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে প্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অন্দে মিশরীয়রা সর্বপ্রথম সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করে। মিশরীয় (Hieroglyph) পদ্ধতিতে সংখ্যার ধারণা ছিল কিন্তু সেখানে শূন্যের ব্যবহার ছিল না। মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল-

গণিত শাস্ত্রে ব্যাবিলনীয়দের অবদান অনেক বেশি। একদিকে জ্যামিতিক শাস্ত্র বিকশিত হয়েছিল মিশরে অন্যদিকে পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিকশিত হয়েছিল ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনীয়রা বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে বিভক্ত করে এবং ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা ও ১২

ঘণ্টায় ১ দিনের প্রচলন করে। তাদের ১ মিনিট ছিল আমাদের ২ মিনিটের সমান। ব্যাবিলনীয়দের অর্জিত জ্ঞান কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও কিছু মৃৎপাত্রে অংকিত ও পাথরের ফলকে খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায় তারা পিথাগোরাসের উপপাদ্য জানত। মিশরীয়দের মতো ব্যাবিলনীয়রাও শূন্যের ব্যবহার জানতো না। মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে সংখ্যার ব্যবহারের পার্থক্য হলো মিশরীয়রা সংখ্যাকে ১০ এর গুণিতক রূপে প্রকাশ করত। ব্যাবিলনীয়রা সেই কাজটি করত ৬০ এর গুণিতক আকারে। তাই ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতিকে ষাটমূলক পদ্ধতি বলা হয়।

ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিতে প্রাচীক

গ্রীক ও রোমানরাও শূন্যের ব্যবহার জানত না। এর একটি বড় কারণ হল গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। গ্রীকরা সংখ্যার জন্য আলাদা প্রাচীক উভাবন করেনি

বরং গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করত। আর রোমান পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখা আজও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখানো হয়। গ্রীক সংখ্যার সারণি-

সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি λ (ল্যামডা) দ্বারা বোঝানো হত ৩০ (কারণ λ এর অবস্থান ৩ নম্বর সারিতে এবং ১০ নম্বর কলামে) এবং β (উচ্চারণ বিটা) দ্বারা বোঝানো হতো ২। তাই গ্রীক পদ্ধতিতে ৩২ লিখতে চাইলে আমাদের লিখতে হবে $\lambda\beta$. রোমানদের পদ্ধতিটি ছিল অনেকটা মিশরীয়দের মতো, যেখানে রোমানরা ১০ লিখতে চাইলে X, হাজার লিখতে চাইলে M দিয়ে প্রকাশ করত।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। তবে এই লিস্টে ব্যতিক্রম ছিল মাঝা সভ্যতা।

Number	Hieroglyph
1-9	(and multiples thereof)
10	
100	
1,000	(with a small circle above it)
10,000	(with a red vertical bar below it)
100,000	(with a green frog-like creature)
1,000,000	(with a red frog-like creature)

মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি

Number	Symbol
1	↑
10	◀
60	↑
600	↑◀

ব্যাবিলনীয় ষাটমূলক সংখ্যা পদ্ধতি

.	1	10	100	1000
1	α	ι	ρ	,α
2	β	κ	σ	,β
3	γ	λ	τ	,γ
4	δ	μ	υ	,δ
5	ε	ν	φ	,ε
6	Ϛ	Ϛ	Ϛ	,Ϛ
7	Ϛ	ο	Ϛ	,Ϛ
8	Ϛ	π	Ϛ	,Ϛ
9	Ϛ	Ϛ	Ϛ	,Ϛ

গ্রীক সংখ্যার সারণি

0	1	2	3	4
•	••	•••	••••	
5	6	7	8	9
•	••	•••	••••	
10	11	12	13	14
•	••	•••	••••	
15	16	17	18	19
•	••	•••	••••	
20	21	22	23	24
•	•	•	•	•
25	26	27	28	29
•	•	•	•	•

মায়া সভ্যতার ব্যবহৃত সংখ্যা প্রতীক

এখানে শূন্য দেখা গেলেও এই গ্রন্থে শূন্যের ব্যবহার ছিল না। আনুমানিক ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে আর্যস্ত সংখ্যা গণনা পদ্ধতি তৈরি করেন এবং একটি বিশাল সংখ্যাকে কিভাবে সহজ লেখা যায় তার জন্য একটি কোড ব্যবহার করেন যেখানে দশক শতক ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন অঙ্কের ব্যবহার করতেন। এখানে শূন্যের জন্য ‘খ’ অঙ্কটি ব্যবহার করেন। হয়তো এখানে ‘খ’ গোল অর্থাৎ মহাকাশ ব্যবহার করেছিলেন। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত তার “ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত”তে ০ (শূন্যকে) সংখ্যার মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি প্রথম বলেছিলেন শূন্যের সাথে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে তার ফলাফল পরিবর্তন হয় না। শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করলে ফলাফল শূন্য হয়। শূন্য দিয়ে

কোন সংখ্যাকে গুণ করলে শূন্য হয়। কিন্তু শূন্য দিয়ে কোন কিছুকে ভাগ করলে ফলাফল কি হয় তা নিয়ে তিনি দ্বিধা-দন্দন্তে ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্তের মৃত্যুর পর্ণিশ বছর পর ভাক্ষারাচার্য শূন্য দিয়ে কোন কিছুকে ভাগ করলে ভাগফল হবে অসংখ্যা (সংখ্যা নয়) (Infinity).

সংখ্যার এই আলোচনায় আবার একটু ইউরোপে যাওয়া যাক, কথাটা শুনতে অবাক মনে হতে পারে যে, প্রথম ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে ল্যাটিন লেখা আরিথমেটিকা অপুস্কালাম বইতে (Zero) শূন্যের ব্যবহার পাওয়া যায়। শূন্যের প্রতি গ্রীকদের অনীহা প্রায়স দুইহাজার বছর বহন করেছিল গোটা ইউরোপ টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বত্বের ধারণায় এ্যারিস্টটলিয় দর্শনকে, এ্যারিস্টটলিয় বিরোধিতা ছিল চার্চের বিরোধিতার সমার্থক। মহাপন্থিত এ্যারিস্টটল ঘোষণা করেছিলেন প্রকৃতিতে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই এবং এই বিশ্বের সবকিছু সসীম, সীমাহীন বলে কিছু হয় না। এ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতবাদের কারণে বহু গণিতজ্ঞরা মুখ ফিরিয়ে নেন শূন্যের চিন্তা হতে মূলত আধুনিক অংক বা সংখ্যাকে (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) আরবীয়া প্রতীক হিসেবে দাঁড় করান। অঙ্কের থেকে শূন্যসহ সকল সংখ্যা প্রতীক আলখারিজমী কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, ন টি আরবীয় সংখ্যার প্রতীক এবং শূন্য ব্যবহার করে ও সেগুলিতে শূন্য আরোপ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীকে নবম শতকে মহামূল্যবান উপহার দিয়েছেন। এটা ছিল নবম শতকের অনন্য উপহার। মুসা আল খারিজমীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এন্টসমূহের প্রধান উৎস ছিল বীজগণিত ও সংখ্যার ব্যবহার যার মধ্যাদিয়ে আরবি সংখ্যাসমূহ পাশ্চাত্যে পরিচিতি হয়ে উঠেছিল।

১২০২ খ্রিষ্টাব্দে পিসার আধিবাসী লিওনার্দো ফাইবোনাচি তার একটি বইতে প্রথম আরবীয় (হুরুফ আল শুবার) সংখ্যা ব্যবহার শুরু করেন। আলবিরনী মত্য করেছেন যে, ভারতীয় নকশার সবচেয়ে সুন্দর রূপ থেকে সংখ্যাসমূহ উত্তীর্ণ হয়েছে।

পরিশেষে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আলখারিজমী ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতির অনুসরণ করে তিনি বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত সংখ্যা লিখনপ্রণালী আবিষ্কার করেন। অনেক পণ্ডিতগণ মনে করেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও গণিত আরবদের অনুবাদের কল্যাণে ইউরোপে পৌছেছিল। আজকের গণিতের ইতিহাসকে ইউক্লিড ছাড়া অসম্পূর্ণতা সেই উইক্লিডের বিস্মৃতির থেকে রক্ষা করেন আরবের অনুবাদ শিল্প। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যা যেন বুদ্ধিমত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আর্বিভূত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, কলা ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তন সংখ্যা ছাড়া অকল্পনীয়।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, গণিত।

ল্যাটিন আমেরিকার এই সভ্যতা সম্পর্কে এশিয়া ইউরোপের ও আফ্রিকার মানুষ জানতে পেরেছে মাত্র ৫০০ বছর আগে অথচ মায়া সভ্যতার বিকাশ আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে। পৃথিবীর অন্য সকল সভ্যতা হতে পুরোপুরি আলাদা সভ্যতা মায়া। লোকমুখে মায়া সভ্যতার অনেক রহস্যময় কাহিনী শোনা গেলেও মায়া সভ্যতার ক্যালেন্ডার মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মজার ব্যাপার হলো মায়া সভ্যতার ক্যালেন্ডার ২০১২ সালের পর আর কোন সাল ছিল না। মায়ানরা নাকি বিশ্বাস করত ২০১২ সালের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মায়া সভ্যতার বিকাশ ঘটে পুরোপুরি স্বতন্ত্রভাবে। তাদের সংখ্যা পদ্ধতি ছিল ৫ ভিত্তিক এবং অবাক করা ব্যাপার হল মায়ানরা শূন্যের জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে মায়ানরা আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতির বেশ কাছাকাছি পৌছেছিল। যোগ ও বিয়োগের জন্য মায়ানদের পদ্ধতিতে বিশেষ সুবিধা ছিল না।

সংখ্যা আবিষ্কারের পরিপূর্ণতা মূলত শূন্যের আবিষ্কারের মাধ্যমে। শূন্যের আবিষ্কারে আনুমানিক ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে। শূন্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাকশালী পাঞ্জলিপিতে (আনুমানিক ২০০ - ৯৯০ খ্রিষ্টপূর্ব) তবে এই বইতে শূন্যকে একটি বিন্দু (.) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হতো। বাকশালী পাঞ্জলিপিতে সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ ছিল।



বাকশালী পাঞ্জলিপিতে ব্যবহৃত সংখ্যামালা



সুষম খাদ্য সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক সানজিদা আক্তার কেয়া

ভূমিকা

বাঁচার জন্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। আর এই খাদ্যের মধ্যে একদিকে আছে পুষ্টিসম্ভব সুষম খাদ্য অন্যদিকে অপুষ্টিকর বাজে খাদ্য। আবার আছে দামি কিংবা সংলগ্নিলের খাদ্য। সুস্থভাবে সুন্দর নীরোগ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজন ভালো পুষ্টিসম্ভব সুষম খাবার। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পুষ্টিসম্ভব সুষম খাবার অনেক দামী। কিন্তু একটু হিসেব করে ও পুষ্টিমান বিবেচনা করে তালিকা করলে কম খরচেই প্রয়োজনীয় সুষম পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের যোগান দেয়া সম্ভব। খাবারের প্রতি আমাদের যেমন অতি রসনাবিলাস ও আগ্রহ আছে পুষ্টির প্রতি কিন্তু তেমনটি নেই। আমাদের দেশে যেমন অনেকেই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে তেমনি অতি পুষ্টিতেও ভুগছে কেউ কেউ। মূলত সঠিক পুষ্টি জ্ঞান ও সাধারণ শরীরচর্চার অভাবে এমনটা হয়। একটু পরিকল্পনা ও বিবেচনা জ্ঞান দ্বারা আমরা নিয়মিত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ভালোভাবে সুস্থ-সুবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারি, হাজারো অসুখ-বিসুখ ও রোগ বালাই থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি।

খাদ্য ও পুষ্টি

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। মূলত দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে, দেহকে সুস্থ ও কর্ম উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, সেসব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের ক্ষমতা অর্জন, শারীরিক সুস্থতার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। পুষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনের একটি প্রক্রিয়া যা জটিল খাদ্য ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। আমরা প্রতিদিন আমাদের চাহিদা মতো যে খাবারগুলো খেয়ে থাকি সরাসরি আমাদের দেহ তা গ্রহণ করতে পারে না। এ জটিল উপাদানসমৃদ্ধ খাবারগুলো আমাদের পরিপাকতত্ত্বে হজম হয়ে দেহে গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রতিদিনের খাবারের গুণসম্পন্ন সেসব উপাদান যা দেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, অসুখ-বসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম করে।

সুষম খাদ্য

যে খাদ্যের মধ্যে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান পরিমাণমত বিদ্যমান থাকে তাই সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ মানবদেহের প্রয়োজনীয় ও পরিমাণমত ছয়টি উপাদানযুক্ত খাবারকেই সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুষম খাদ্য তালিকা দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান দেয়। এটি ব্যক্তি দেহে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের অভাব মেটায়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বয়স, চাহিদা ও পরিশ্রম অনুযায়ী সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু খাদ্য গ্রহণের সাথে অপুষ্টি ও খাদ্য সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী রোগের বিষয় জড়িত তাই এগুলোর হার কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নিজৰ খাদ্যাভ্যাসের সাথে মিল রেখে প্রতিটি দেশের একটি খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ তে জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন পূর্ণব্যক্ত সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ এবং নারীর ২০০০ কিলোক্যালরি শক্তিসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। যেকোন সুষম খাদ্য তালিকায় শর্করা, শাকসবজি, ফলমূল আমিষ এবং স্লেহ জাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। শর্করা নিচে রেখে পরিমাণ বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ ও স্লেহজাতীয় খাদ্য সাজালে যে কান্নানিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে সুষম খাদ্য পিরামিড বলে।

(ক) খাদ্য উপাদান : খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তি সময়ে গঠিত যা খাদ্য উপাদান হিসেবে পরিচিত। এগুলোর স্বাদ ও গুণাগুণ উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

- আমিষ বা প্রোটিন
- শকরা বা শ্বেতসার
- লেহ বা চর্বি

এছাড়াও ৩ প্রকার অন্যান্য উপাদান বিশেষ প্রয়োজন। যথা:

- খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন
- খণ্ড লবণ
- পানি।

কাজেই আমরা মৌলিক খাদ্য গোষ্ঠীকে চারটি বিভাগে ভাগ করতে পারি। যথা :

- দেহ গঠনকারী : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য শ্রেণি।
- শক্তি প্রদানকারী : চাউল, গম ইত্যাদি শস্য জাতীয় খাদ্য।
- রোগ প্রতিরোধকারী : ভিটামিন জাতীয় শাকসবজি ও ফলমূল শ্রেণি।
- শিশুর চাহিদাপূরণকারী : দুধ ও দুর্ঘজাতীয় খাদ্য।

(খ) সুষম খাদ্য তালিকা: যে সমস্ত খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে, টিস্যু কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তায় কার্যাবলিকে সুস্থিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে সুষম খাদ্য বলে। অপরাদিকে খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানের যেকোন একটি কম বা অনুপস্থিত থাকলে তা অসম খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষণীয়-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণ শাক-সবজি।
- মাছ বেশি খেতে হবে।
- মিষ্টি ও তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার কম।
- লবণ কম খেতে হবে।
- দৈনিক গৃহিত ক্যালরির ৬০-৭০% শর্করা, ১০% আমিষ ও ৩০-৪০% লেহ জাতীয় পদার্থ হতে হবে।



নিম্ন খাদ্য তালিকা অনুসরণ করে একটি মেনু পরিকল্পনার উদাহরণ দেওয়া হলো :

সময়	খাদ্যশস্য শ্রেণি	মাছ মাংস শ্রেণি	শাক-সবজি শ্রেণি	দুধ ও দুর্ঘজাত শ্রেণি
সকালে	আটার রুটি	ডিম	যেকোন ভাজি	দুধ মিশ্রিত চা বা দুধ
দুপরে	ভাত	মাছ	যেকোন শাক	দই বা পায়েশ
রাতে	ভাত/রুটি	মাংস	নিরামিষ	দুধ/মিষ্টি

সম্ভব হলে তিনটি মূল খাবারের মাঝখানে দুটি হালকা নাস্তা হিসেবে (১১.০০টা ও ৫.০০টায়) যেকোন ফল বা ফল হতে তৈরি সালাদ গ্রহণ করতে হবে।

গ) সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়নের নীতিমালা:

ব্যক্তির বয়স, যোগ্যতা, প্রয়োজন ও পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয় যা খাদ্য মেনু নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়-

- ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান খাকতে হবে।
- পেশার মূল্যায়ন করতে হবে। অধিক শারীরিক পরিশ্রমাদের ক্যালরি অধিক ক্ষয় হয়। তাই খাদ্যের পরিমাণ বেশি হওয়া জরুরি।
- সুষম খাদ্য খুব দামি উপাদান সমৃদ্ধ কিংবা বড় মাছ হবে তা নয়। বিকল্প উপায়ে অল্প ব্যয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণ সম্ভব।
- খাদ্য নির্বাচনের সময় সহজলভ্যতা এবং দামের দিক বিবেচনায় নিতে হবে।
- সুষম খাদ্য পুষ্টি বজায় রাখার জন্য সঠিক রন্ধনপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশনে যথার্থভাবে পরিকার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টি প্রাপ্তি

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপদ, পুষ্টিকর ও সুসম খাদ্য গ্রহণ জরুরি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ ও সুফল-কুফল সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য ও রান্না সম্পর্কিত বিষয়াবলি যেমন কিভাবে রান্না করলে খাদ্যের পুষ্টিমানের অপচয় রোধ হবে ও সুস্থান্ত বজায় থাকবে তা অনুসরণ করতে হবে। প্রতিদিন সুসম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ, পরিমিত আয়োডিনযুক্ত লবন, মিষ্টিজাতীয় খাবার সীমিত পরিমাণে গ্রহণ, প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পান, নিয়মিত শারীরিক শ্রম, সঠিক খাদ্যাভাস এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যন্ত হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

১. সাধারণভাবে বসাভাত রান্না, সম্ভব হলে লাল চাল ও আটা গ্রহণ রান্নায় উদ্ভিজ্জ তেল যেমন- সরিষা, সয়াবিন, রাইসব্রান তেল ব্যবহার, অতিরিক্ত ভাজা ও তেলাক্ত খাবার (কেক, পেস্ট্ৰি, ফাস্টফুড, হটডগ, বার্গার, কাচি, বিরিয়ানি, রেজালা, প্রক্ৰিয়াজাত মাংস, ছিল) বর্জন। এগুলোতে ট্রাসফ্যাট থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
২. খাবার পাতে বাড়িত লবণ বর্জন করা। টেস্টিং সল্ট ও কোমল পানীয়, ক্যান্ডি, জেলির পরিবর্তে তাজা ফলের রস ও ফল গ্রহণ করা। প্রতিদিন কমপক্ষে ১.৫-৩.৫ লিটার বা ৬-১২ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।
৩. দেশীয় শাক যেমন: পুইশাক, লাউশাক, লালশাক, পাটশাক, কচুশাক খাওয়া উচিত। বিদেশী ফলের পরিবর্তে দেশীয় স্থানীয় মৌসুমী ফল গ্রহণ বাস্তুনীয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাণিজ প্রোটিনের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ যেমন, সয়াবিন বা সয়াপ্রোটিন, বিভিন্ন প্রকার ডালের ব্যবহার বাড়াতে পারে।
৪. শাক-সবজি ধূয়ে কাটা এবং দ্রুত ও উচ্চ তাপে ভাপা/সিদ্ধ করা এবং তেলে ভাজি করার চেয়ে সেঁকে খাওয়া খাবার অধিক পুষ্টিসম্মত। কম মসলা, রান্নায় ঢাকনা ব্যবহার এবং খাবার কম ও বেশি গ্রহণ বর্জন, করে পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ বাস্তুনীয়। খাবার ঢেকে রাখা এবং পচাবাসি খাওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।
৫. শৈশবের যত্নে শিশুর ভবিষ্যত গড়ে ওঠে। তাই সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুর যত্ন ও খাদ্যাভাস জরুরি। জন্মের সাথে সাথে শাল দুধ পান, ৬ মাস পর্যন্ত নিবিড় দুধপান, পরবর্তীতে দুধের পাশাপাশি পরিপূর্বক খাদ্য (নরম ভাত, ডাল, আলু পাকা কলা, খিচুড়ি, ডিম ও মাছ) প্রদান। জোর করে না খাইয়ে আগ্রহ জাগিয়ে এবং বৈচিত্র্যময় খাবার প্রদান করতে হবে।
৬. সুস্থান্ত বজায় রাখার জন্য দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা স্থুমের অভ্যাস করা। খাবার আগে ও বাথরুম ব্যবহারের পর হাত ধোয়ার অভ্যাস, দৈনিক একবার গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি। নতুনা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য কাজে আসবে না।
৭. সচেতনতা অতি জরুরি। খাদ্যপণ্য কেনার সময় উৎপাদন, মেয়াদ এবং পুষ্টিগুণ দেখে নেয়া উচিত। তাছাড়া ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও রং ব্যবহারকৃত টিনজাত খাবার কম গ্রহণ বাস্তুনীয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং বাস্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যের সমন্বয় পরিপূর্ণ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এখনও একটা বিৱাট চ্যালেঞ্জ। আৱ এ কাৱণেই বাংলাদেশেৰ প্রায় ৩৩% শিশু ক্যালোরিজনিত পুষ্টিহীনতায় ভোগে, যার মধ্যে ৩৬% আকাৱে খাটো, কৃষকায় ১৪% এবং নিম্ন ওজনে প্রায় ৩৩%। গড়ে ২৫% মহিলা দীৰ্ঘজীৱী ক্যালোরিজনিত অপুষ্টিতে ভোগে যাদেৱ একই সাথে জিংক, আয়ৱন ও আয়োডিনেৰ স্বল্পতা রয়েছে। এখানে লক্ষণীয় আমৱা যে খাবার পছন্দ কৱি তাই সবসময় বেশি পুষ্টিমানে খাই। এজন্য আমাদেৱ খাদ্যে বৈচিত্র্য কম এবং খাদ্য মেনু প্রস্তুত কৱি না বিধায় সঠিক পুষ্টি প্রণালী অনুসৃত হয় না। কাজেই সতেজ বিষমুক্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারেৰ প্রতি আমাদেৱ বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খেয়ে আমৱা পুষ্টিসমৃদ্ধ জাতিতে পুষ্টিগত হব- এটাই হোক আমাদেৱ নিত্য এবং আন্তরিক কাৰ্যকৰ অঙ্গীকাৱ।

তথ্যসূত্র:

১. জাতীয় ই-তথ্যকোষ, খাদ্য ও পুষ্টি
২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোৰ্ড, বাংলাদেশ, অষ্টম শ্ৰেণি, বিজ্ঞান বই।
৩. কৃষিবিদ ড. মো. জাহাঙ্গীৰ আলম, উপপৰিচালক, (গণযোগাযোগ), কৃষি তথ্য সাৰ্কিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫ (অনলাইন সংক্রণ)
৪. মীৱ আপুল আলীম, গবেষক ও সাংবাদিক, খাদ্যে ভেজাল ও আমাদেৱ কৱণীয়, আগস্ট ১৩, ২০১৭ (অনলাইন সংক্রণ)
৫. ফারজানা খানম শিমুল, চিফ ফিটনেস ট্ৰেনাৰ, পারসোনা হেলথ, ২০ আগস্ট ২০১৫ (অনলাইন সংক্রণ)।
৬. খাদ্যচিত্ৰ Google Picture থেকে সংগ্ৰহীত।

লেখক : সহকাৰী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ।



প্রিনিপাল ইব্রাহীমঁর্ণ

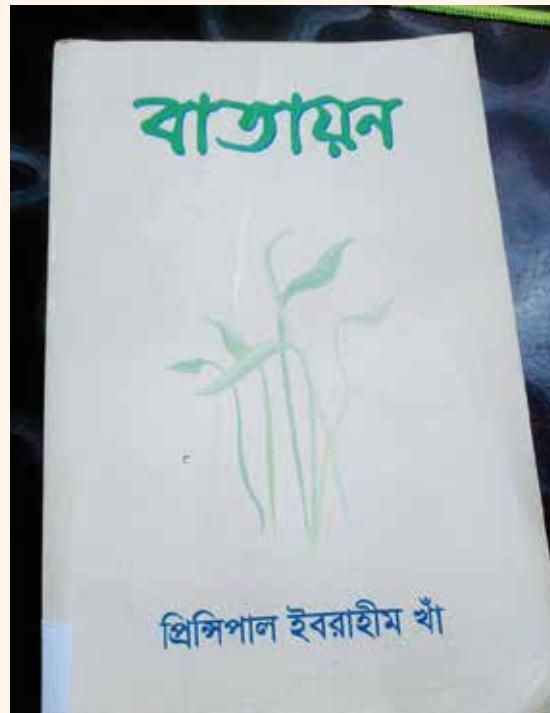
শামস উদ্দিন চয়ন

‘প্রিনিপাল’ বলতে একজন লোককেই বোঝায়, তিনি হলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য সাধক, সব্যসাচী লেখক ইব্রাহীম খাঁ। ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) একাধারে তিনি একজন শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক, মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদুত, গল্পকার, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, জীবনীকার, অ্রমণকাহিনি-রচয়িতা, পত্র-লেখক, স্মৃতিকথক, শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক। ‘বাতায়ন’ তাঁর স্মৃতিকথা পর্যায়ের লেখা। ১৯৬৭ সালের প্রথম প্রকাশিত হলেও ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত। আয়তনে বিশাল ৫২৫ পৃষ্ঠার এ আকর গ্রন্থে বিষয় রয়েছে সর্বমোট ৪৩টি। ইব্রাহীম খাঁর জীবনীকার বশীর আলহেলাল এর ভাষায় ‘বাতায়ন অসাধারণ গ্রন্থ, আয়তনে বহুৎ কিন্তু সুখপাঠ্য, কেবল স্মৃতিচারণ নয়, এ যেন অজস্র তথ্যের কোষগ্রন্থ।

‘বাতায়ন’ তাঁর পাঠকের জন্য সবকটি বাতায়নই খুলে রেখেছে। এই আতাজৈবনিক রচনায় ব্যক্তি ইব্রাহীম খাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১১৮ হলেও বলতে হয় বাতায়ন-ই শ্রেষ্ঠ। এতে তাঁর পুরো জীবনই উঠে এসেছে। প্রিনিপাল ইব্রাহীম খাঁর বাতায়নে উঠে এসেছে সমগ্র সমাজ। তাঁর সমাজ-দর্শনের মূলে ছিল মানুষ। তিনি জীবন সূচনাকাল থেকে সায়াহের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো এবং অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে যে জীবন জিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছেন তারই এক বন্ধনিষ্ঠ দলিল বাতায়ন গ্রন্থটি।

বাতায়ন ইব্রাহীম খাঁর সবচেয়ে মূল্যবান বই, কেননা এটি আমাদের অতীত ইতিহাসের একটি জানালা স্থায়ীভাবে খুলে রেখেছে। একটি সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পরিচয় আমরা পাই গ্রন্থিতে। তৎকালীন খেলাফত আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, দেশভাগসহ প্রাক্যাধীনতা সমাজ ব্যবস্থায় বাঙালি মুসলমানদের পুর্ণাগরণের সংগ্রাম ও সাধনার চিত্র পাওয়া যায় বাতায়নে। স্মৃতিকথা একই সঙ্গে সাহিত্য, সমাজচিত্র ও ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। বাতায়ন এর লেখাগুলোতে বন্ধুত্ব গ্রাম্যাদানের প্রতিনিধিত্বানীয় করাটিয়া পল্লীর দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবনের বহু-বিচিত্র অভিভূতা, লোকসাহিত্য, সামাজিক আচার-আচরণ, সংস্কার ও সংস্কৃতিকে যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সেকালের পাঠশালা, স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ, পল্লীজীবন, সমাজ-জামাত, বহু বিবাহ, পরদা, শরা-শরীয়ত, বারবাণিতা, বাহাদুর, উঠ-বস, আদব-লেহাজ, মুনাফির, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, উৎসবসহ বহু বিচিত্র ধারার অন্তরঙ্গ বর্ণনা রয়েছে গ্রন্থিতে। শ্রেণিচেতনার মধ্যে ধোপা, নাপিত, মালী, মেঘর, কামলা জামলা, ফকির মিসকিন, বৈরাগী বৈষ্ণবী, ফয়ফকিলী, পা-মোছা সূতার, হরি, সাধু, শিরালু, গণক, রাখালসহ পোশাক পরিচ্ছদ, গয়নাপাতি, সাজগোজ, অসুখ বিসুখ, চিকিৎসা, বান-মারা, ভূত-পেত্রী ও বিভিন্ন মন্ত্রসহ সংস্কৃতির নানা বিষয় যেমন হাঁটিঘর, বিয়েশাদী, আহার্য জিনিস, মাছ শিকার, বাসন-কোসন, ঘরদুয়ার, পান-তামাক, পহরা,



লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় বাতায়ন গ্রন্থে।

‘স্মৃতির প্রথম কয়েকটি ছবি, মৎসা, শৈশবের বীরত্ব, সিরাজী সাহেব, নারীর স্থান, ‘শিশু মহল’, প্রভৃতি পরিচেছেগুলো নামকরণ থেকেই তৎকালীন সময়ের নানা বিষয় সম্পর্ক আমরা জানতে পারি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী আদুল ওদুদ, মওলানা মনিরজ্জামান, আবুল হোসেন মুজফফর আহমেদ, মহাত্মা গান্ধী, চিত্ত রঞ্জন দাশ, মওলানা আকরম খাঁ, জসীমউদ্দীন, কায়কোবাদ, এ কে ফজলুল হক, পি.সি.রায়, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিসহ বিভিন্ন বিদ্যান্ধি, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় সম্পর্কে ইব্রাহীম খাঁর নিজস্ব মনোভাবের নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে ‘বাতায়ন’ গ্রন্থিতে।

ইব্রাহীম খাঁ ছাত্রদের নিজের সত্ত্বারে মতো ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের কেতাবী শিক্ষার বাইরে মানবীয় চেতনা ও আদর্শের শিক্ষা দিতেন। তিনি মনে করতেন ছাত্রদের সমস্যার জন্য শিক্ষা-ব্যবসা দায়ী। ছাত্রদের সামনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি করটিয়ার প্রথ্যাত ও প্রশংস্য ব্যক্তিদের আনতেন। তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে করটিয়া আনার চেষ্টা করেছিলেন যেন কবির সাহিত্য সাধনার পথ কিছুটা হলেও নির্বিন্দ ও সুগম হয়। পরে এক হিন্দুমেয়ের সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ায় কবিকে আর করটিয়ায় আনা যায়নি। কবির সঙ্গে ইব্রাহীম খাঁর স্থায় ছিল, ছিল গভীর অতরঙ্গতা, ১৯২৫ সালে কাজীর নিকট প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁ দেড় পৃষ্ঠা ঐতিহাসিক চিঠির জবাবে ৩ বছর পর হলেও সওগাত পত্রিকার নয় পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হয়েছিল। ‘বাতায়ন’ গ্রন্থের ‘নজরুলের সঙ্গে পত্রালাপ’ পরিচেছে ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন ‘কেউ কেউ মনে করেন, পত্র দুটি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে। আমি জানি, আমার পত্র যদি বেঁচে থাকে তবে নজরুল ইসলামের পত্রকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকবে।’

পরিশেষে বলা যায়, প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁ আটপোরে গ্রামীণ ভাষায় আঞ্চলিক বাক্যালিতিতে, গণমানুষের মুখনিঃস্ত বাক্যালিকারে তাদের সহজ সরল জীবন ও বোধবিশ্বাসকে সহজ উপলব্ধির উপযোগী করে বাংলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাসের যথার্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাতায়ন রচনা করেছেন। তাঁর বাতায়ন রচনা একজন শিক্ষাবিদ সমাজ সংগঠকের জীবনদর্শন ও সমাজভাবনার লিখিত রূপ। মুক্তবুদ্ধি চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে উচ্চকক্ষ আবেগ তাঁর বাতায়ন রচনার মূল সুর। সাহিত্যকে গণ-মানুষের পাঠ্যপঞ্চাঙ্গে করে এবং তাদের জীবনের বাণীকে যথাযথ রূপায়নের মাধ্যমে তাদের বৃহত্তম কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর বাতায়ন রচনার মূল উদ্দেশ্য। প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁর নিজ হৃদয়ের নানা জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা, সেই-সঙ্গে প্রাক-আয়াদী ও আয়াদী উত্তরকালীন আমাদের সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতির ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাতায়ন আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

তথ্যনির্দেশ :

১. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সম্পাদিত, ইব্রাহীম খাঁর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৪, পৃ. ৭২৩।
২. আব্দুল হালীম খাঁ, জনমানুষের বন্ধু প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁ, মদীনা পাবলিকেশান্স, জুলাই ২০০১।
৩. আজিজুর রহমান, দেওয়ান আব্দুল হামিদ, মফিজউদ্দিন আহমেদ, আহমাদ কাফিল (সম্পাদিত), প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁ, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯১।
৪. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ও মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান (সম্পাদিত), প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁ আরকণ্ঠ, প্রিলিপাল ইব্রাহীম খাঁ ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০০৪।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও কোষাধ্যক্ষ, শিক্ষক পরিষদ।

‘বাতায়ন’ গ্রন্থের ‘নজরুলের সঙ্গে পত্রালাপ’ পরিচেছে ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন ‘কেউ কেউ মনে করেন, পত্র দুটি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে। আমি জানি, আমার পত্র যদি বেঁচে থাকে তবে নজরুল ইসলামের পত্রকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকবে।’



মহানায়কের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মো. হাসান মিয়া

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক দশদিন আগে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ৬ তারিখ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক অনন্দাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখেছিলেন-

‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেধনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ অঙ্গগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় শেখ মুজিবুর রহমান।’

হাজার বছরের মধ্যে বাঙালির জীবনে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি, স্বাধীন কোনো ভূখণ্ড গড়ে ওঠেনি। বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু, বাঙালির সহস্র বছরের স্বাধীন রাষ্ট্র সত্ত্বার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সেই হিসেবে তিনি মহানায়ক, মহান রাষ্ট্রনায়কও। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে ‘A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way’। জাতির জনক ছিলেন সেরকম সত্যিকার একজন নেতা, কারণ তিনি পথ চিনতেন, সে পথে চলতেন এবং অন্যদের সে পথে পরিচালিত করতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশটাই ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, এ রকম মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন প্রবাহিত হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই কিন্তু এভাবে একটি সাধারণ নেতৃত্বের পর্যায় থেকে একেবারে মহান নেতার পর্যায়ে পৌঁছেছেন। বঙ্গবন্ধুও তাই। সর্বোপরি এ দেশের দুর্ঘো-দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর নিরন্তর ও নিরলস সংগ্রাম এবং দাবি আদায়ে দীর্ঘ কারাবাসের মুখে দৃঢ় মনোবল তাঁকে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তি।

১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফায়জালাবাদ (লায়ালপুর) কারাগারে প্রহসনমূলক বিচারের রায়ে রাষ্ট্রদ্বোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এরপর লায়ালপুর কারাগার থেকে স্থানান্তর করা হয় মিয়ানওয়ালি জেলে। ‘জেলের ডেপুটি সুপার ফজলদাদ একদিন ব্যারাকে এসে আটজন বন্দির বাছাই করেন। এদের দিয়ে আট ফুট লম্বা, চার ফুট প্রশস্ত ও চার ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া হয়। উপস্থিত সবাই বুবাতে পেরেছিলেন, সেই রাতেই শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ৯টার মধ্যে কবর খোঁড়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই রাতে কিছু ঘটেনি। ফাঁসি দেওয়ার নির্ধারিত দিন জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করে শেখ মুজিবকে ফাঁসি না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি মুজিবকে ফাঁসি দেওয়া হয় তবে বাঙালির ক্ষেত্রের লক্ষ্য হবে পূর্বাঞ্চলে মোতায়েনকৃত পাকবাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসার থেকে সর্বনিম্ন সৈনিক পর্যন্ত সবাই। ভুট্টোর উপদেশ অনুসারে ইয়াহিয়া খান মুজিবের ফাঁসি স্থগিত রাখেন। কয়েকদিনের জন্য কবর ভরাট করা হয়। ১৫ দিন পর একইভাবে গর্ত খোঁড়ার ভকুম আসে। সেবারও শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়া হলো না। এমন প্রক্রিয়া তিনবার ঘটেছিল এবং তিনবারই তার ফাঁসি পিছিয়ে দেওয়া হয়।’ ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে ইয়াহিয়া খান আর সেই আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ উল্লাসে মেতে ওঠে। তবে তখনও শক্ত কাটেন। কারণ যার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে তিনি তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। ২২ ডিসেম্বর প্রথম

বাংলাদেশ সরকার কলকাতা থেকে স্বাধীন দেশে ফিরে আসে। ভারপ্রাণ রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথমেই বলেন, ‘বাংলাদেশের বিজয় এখনো অসম্পূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।’ ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, “শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্বৃপ্তি, কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাঁকে বন্দি করে রাখার।”

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, যাকে সাড়ে নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারের অন্দরার ঘরে বন্দি রাখা হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১’র পর সরিয়ে নেয়া হয়েছিল কারাগার থেকে দূরে আরো দুর্গম জায়গায়। ২৪ ডিসেম্বর একটি হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুকে রাওয়ালপিণ্ডির অদূরে শিহালা পুলিশ একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে আসেন। ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রস্তাব দিলে জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, “না, আমি তা চাই না। তবে যত দ্রুত সম্ভব আমি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাই।” ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন।

উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “তুমি যদি আমাদের কথা শুনতে তবে রক্তপাত এড়ানো যেতো এবং পরবর্তীতে যা কিছু ঘটেছে তাও। কিন্তু তুমি নির্মম সশস্ত্র হামলা চালিয়েছ। দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তা ছাড়া আর কিভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমি জানি না।”

৩ জানুয়ারি, ১৯৭২-এ ভুট্টো করাচিতে এক জনসভা ডাকেন। সেই জনসভায় তিনি বলেন, দেশকে তিনি সামরিক শাসন ও প্রেরাচারমুক্ত করেছেন। দেশে এখন গণতন্ত্র, তথা জনগণের শাসন কায়েম হয়েছে। জনমতের ওপরই সবকিছু চলবে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জনগণের ইচ্ছার বিকল্পে কিছু করতে পারি না। কারণ, আমরা জনগণের সরকার। আমরা একনায়কত্বকে কবর দিয়েছি।’ নাটকীয় ভঙ্গিতে এসব কথা মানুষকে আবেগাক্রান্ত করে, কিন্তু আকস্মিকভাবেই বলেন, ‘আপনারা কি মুজিবকে মুক্ত করে দিতে আমাকে সম্মতি দেবেন?’ জনগণ উচ্চ স্বরে তা অনুমোদন করে।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠিয়ে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে বহন করা বিমানটি লন্ডনের হিন্দু বিমানবন্দরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টি গোপন রাখা হয়। হিন্দু বিমানবন্দরে পৌঁছার এক ঘণ্টা পূর্বে ব্রিটিশ সরকারকে জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই অবতরণ করবেন। হিন্দু বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ব্রিটেনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। হোটেলে পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যে তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা লেবার পার্টির হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। হ্যারল্ড উইলসন প্রথম কোনো রাজনৈতিক নেতা যিনি কর্মদণ্ডের জন্য বঙ্গবন্ধুর দিকে হাত বাঢ়িয়ে প্রথম উচ্চারণ করেন ‘গুডমার্নিং মিস্টার প্রেসিডেন্ট’। এরপর বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যান। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করেন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ। তাঁদের বৈঠক হয় আন্তরিক পরিবেশে। বৈঠকে এডওয়ার্ড হিথ বলেন—‘আপনাকে

কী সহযোগিতা করতে পারি বলুন।’ বঙ্গবন্ধু বলেন—‘আমি দ্রুত দেশে ফিরতে চাইছি।’ বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু গাড়িতে উঠার সময় প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ সৌজন্য প্রদর্শন করে গাড়ির দরজা খুলে দেন। কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এমন সম্মান পূর্বে দেখাননি। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী হিথ সমালোচনার জবাবে বলেছিলেন—‘আমি যাকে সম্মান প্রদর্শন করেছি, তিনি একটি জাতির মুক্তিদাতা মহান বীর। তাকে এই সম্মান প্রদর্শন করতে পেরে বরং আমরাই সম্মানিত হয়েছি।’ জাতির পিতা শুধু বাঙালির বন্ধু নন, তিনি ছিলেন বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু তথা বিশ্ববন্ধু। বিশ্ব নেতারা তাঁকে এভাবেই সম্মোধন করতেন।





করেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের। এতে সম্মতি দেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বঙ্গবন্ধু এমনই বিচক্ষণ নেতা ছিলেন যে, এরকম একটি অবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্রনায়কেচিত প্রজ্ঞায় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যর্পণের বিষয়টি আলাপ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি আদায় করে নেন।

১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর কমেট বিমানটি দুপুর ১:৫১ মিনিটে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যান এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন আমার ফাঁসির হৃকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার কবর খোঁড়া হয়েছিল। ... আমি ঠিক করেছিলাম, আমি নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মধ্যে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।’ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাবো না। মরতে হলে আমি এখানেই মরবো। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।’ এর চেয়ে তৈরি দেশপ্রেম আর কী হতে পারে! এটাই বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল শক্তি। সততা, নিষ্ঠা, একস্থাতা, তৈরি দেশপ্রেম এবং দেশের মানুষের প্রতি অক্ষতি অক্ষতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধই বঙ্গবন্ধুকে কালের নায়ক হওয়া সত্ত্বেও মহাকালের মহানায়কে পরিণত করেছে।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে একটি জাতিকে চিরদিনের জন্য গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছিলেন। পাকিস্তানি কারাগারে নিহত হলে তিনি হয়তো শহিদ হয়ে অবিস্মরণীয় হতেন। কিন্তু বাংলাদেশে ঘটত চরম অরাজকতা ও হানাহানি। খণ্ড-বিখণ্ড হতে দেশটি। এ সত্যটিও মনে রাখতে হবে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনেক জনপ্রিয় নেতাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেন নাই। শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে, তিনি দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে সেই স্বাধীনতাকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। অন্য কারও পক্ষে এই দুর্জন কাজটি করা সম্ভব হতো না। তিনি দেশে ফিরে নির্মানভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন,



কিন্তু একটি মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ রেখে গেছেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভোরে লন্ডন থেকে ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট জেট বিমানটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর) অবতরণ করলে তাঁর সম্মানে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। অভ্যর্থনার আনন্দান্বিত শেষে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বঙ্গবন্ধু একান্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ

নেতৃত্বের গুণে সব জায়গায় নেতারা ‘মহান’ নেতায় রূপান্তরিত হয়ে যান। যেমন মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা গান্ধী হয়েছেন। আবার নেলসন ম্যান্ডেলা হয়েছেন মাদিবা, জেলে থেকে একের পর এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তেমনি বঙ্গবন্ধু হয়েছেন জাতির পিতা। নেতৃত্বের ‘দূরদৃষ্টি ও বলিষ্ঠতা’ এ দুটো না থাকলে মহান নেতা হওয়া যায় না।

বস্তু ১৯৪৮ সাল থেকেই জাতীয়তাবাদী সব আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু জড়িত ছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে তিনি জনগণের সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করেন এবং বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একজন অনমনীয় নেতা হিসেবে জনমনে স্থান করে নেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেখ জীবনে ‘সভ্যতার সঙ্কট’ প্রবন্ধে বলেছিলেন, “আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মাদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঙ্ঘিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।” হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কথাটি বলেন নাই, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে কথাটি যেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই মিলে গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ দুটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বঙ্গবন্ধু নামটি একটি ইতিহাস। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল মাত্র ৫৫ বছরের পার্থির জীবনের সমগ্র সময়ই একটি মহাকাব্যের ইতিহাস। যদিও মহাকালের কাছে অর্ধশতাব্দী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্র। তারপরও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব গান্ধেয় অববাহিকার পললসমৃদ্ধ এই বাংলাদেশ সৃষ্টির মহাকাব্যের যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তা অনন্তকাল বহুতা নদীর প্রাতের মতো বহমান থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫); পঃ ৩০০; অসমাঞ্চ আত্মজীবনী; শেখ মুজিবুর রহমান; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; প্রকাশকাল ২০১২
২. মুজিব ভাই: এবিএম মুসা; প্রথমা প্রকাশন; প্রকাশকাল ২০১২
৩. শেখ মুজিবুর রহমান: ফুম রেবেল টু ফাউণ্ডিং ফাদার, সৈয়দ বদরজ্জল আহসান; নিয়োগী বুকস; প্রকাশকাল ২০১৪
৪. রবীন্দ্র রচনাবলী; সভ্যতার সঙ্কট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রকাশকাল ১৯৩৯
৫. পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন: আহমেদ সালিম; সাহিত্য প্রকাশ; প্রকাশকাল ২০১৪
৬. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ: ড. আনু মাহমুদ; ন্যাশনাল পাবলিকেশন; প্রকাশকাল ২০১৭
৭. মহানায়ক: তোয়াব খান; দৈনিক প্রথম আলো; ১৫ আগস্ট ২০১৭
৮. পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু; ওয়াসিম বিন হাবিব; ডেইলি স্টার অনলাইন বাংলা পোর্টাল; ৭ জানুয়ারি ২০২০
৯. মহাকালের নায়ক ও ইতিহাসের ছায়াচ্ছম প্রহর; ড. এম শাহ নওয়াজ আলি; দৈনিক যুগান্তর; ১৮ আগস্ট ২০১৮
১০. মনে পড়ে সেই দিন; তোফায়েল আহমেদ; দৈনিক সমকাল; ১০ জানুয়ারি ২০১৮
১১. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনীতির মূলমত্ত্ব; রাহমান নাসির উদ্দিন; বাংলা ট্রিভিউন; ১৬ আগস্ট ২০২০

লেখক : প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ।



একুশ শতকের গ্রামীণ শিক্ষা

মোঃ আফজাল হোসাইন

একুশ শতকের গ্রামীণ শিক্ষা দ্বারাই সচেতন পরিবার, সুশীল সমাজ, আধুনিক রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সভ্যতা গঠিত হয় ও বিস্তার লাভ করে। শিক্ষা ছাড়া বর্তমানে এক মুহূর্তও কল্পনীয় নয়। কেননা বর্তমানে সকল কিছু শিক্ষার সাথে গভীরভাবে জড়িত। তাই তো আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার গুরুত্ব তুলনাহীন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলার গ্রামীণ পর্যায়ের শিক্ষাও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এলাকায় এলাকায় পান্না দিয়ে তৈরি হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল; তাদের মধ্যে চলছে জি.পি.এ এর প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থীদের সার্বিক খেয়াল রাখার জন্য তাদের সাথে প্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধি পাচ্ছে অভিভাবকের সংখ্যাও। স্কুল শেষ হতে না হতে হাজির হয় প্রাইভেট চিচার। শুধু কি তাই! গ্রাম পর্যায় থেকেও বর্তমানের মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী পৌঁছে গেছে। বাহ! তাহলে যে কেউ নিশ্চাস না ফেলেই স্বীকার করবে যে, পল্লী এলাকায়ও শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রসার ঘটেছে। কিন্তু আসলে কি তা হয়েছে? উভরে সবাই হ্যাঁ বললেও নিতান্তই তার বিপরীতটা সত্য বলে গণ্য হবে। কিন্তু কেন? শিক্ষার এত বিস্তারের পরেও তা কিভাবে হয়? চলুন তাহলে, সেদিকটাই আলোচনা করি। তারপরই না হোক মতামতটা নির্ধারণ করা যাবে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। তাই দূরে কোথাও না গিয়েও প্রাথমিক শিক্ষা ভালভাবেই ইতি ঘটায়। মাধ্যমিক পর্যায়েও দেখা দেয় না তেমন কোন সমস্যা। তবে পিতার-মাতার সেই সর্তকতা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে থাকে অনেক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। তবে মূল সমস্যা শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে। নারীদের ক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলো আগে আমার দৃষ্টিতে আসে। বাংলাদেশের শিক্ষার অধ্যপতন কিংবা সাফল্য উভয় ক্ষেত্রেই অনেকিক ভূমিকা রাখে আবাসিক স্কুলগুলো।

বিশ শতকের পূর্বে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না, বর্তমানে সেই সুযোগ থাকলেও তা গ্রামীণ পর্যায়ে বহুদূর বিস্তার লাভ করেনি। কারণ এর অন্যতম বাধা হচ্ছে বাল্যবিবাহ, এখনো প্রায় ৭০-৯০% বিবাহ হয় অপ্রাপ্ত বয়সে। এছাড়াও অভিভাবকরা এখনো বিশ্বাস করে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে কী লাভ? বিয়ের পরে তো স্বামীর বাড়ি চলে যাবে। তাই অথবা টাকা খরচ করার দরকার নাই। আরো একটি কারণের মধ্যে হলো— আর্থিক সংকট। তাছাড়াও উচ্চ শিক্ষার জন্য স্থানকে দূরে কোথাও যেতে দিতে রাজি নয়, ফলে শিক্ষার্থী ইচ্ছা থাকলেও তা আর পূরণ হয় না। অনেকেই আছে যারা উচ্চ শিক্ষার মার্বাপথে যেয়েও বিভিন্ন সমস্যায় তা থেমে যায়। যার ফলে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, ঐ এলাকায় নারী উচ্চ শিক্ষার হার ১০% এরও নিচে।

ছেলেদের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন কারণ। যে কারণগুলো মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথ ছাড়াতে নির্মতাবে বাধ্য করে। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যেও অন্যতম হচ্ছে আর্থিক সংকট। কারণ তাদের অধিকাংশ অভিভাবক হয়ে থাকেন কৃষক, শ্রমজীবী, দিনমজুর, ভ্যান বা রিঞ্চালক ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত। ফলে তারা পরিবার থেকে তুলনামূলক টাকা না পেয়ে বাধ্য হয় শিক্ষার ইতি টানতে। অনেকেই এলাকার বিভিন্ন উচ্চার্থের সাথে মিশে আস্তে হয় নেশা, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যার মতো জরুর্যতম খারাপ কাজে জড়িত হয়। গ্যাং কালচার তৈরি হয়। অভিভাবক আবার অনেক কেই বাধ্য করে কর্মমুখী হতে। ফলশ্রুতিতে তারা অধ্যয়ন পরিয়াগ করে নিযুক্ত হয় কর্মক্ষেত্রে। এছাড়াও আরও এক শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে যারা পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত থাকে, তাদের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা নয়, সার্টিফিকেট। প্রতিটি এলাকায় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ২০-৩০% শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাতিক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হলেও সে শিক্ষা শিক্ষার হিমালয়ে চূড়ায় নিয়ে যায় খুবই নগণ্য। আমাদের দেশে শিক্ষার হার ক্রমাগত হারে বৃদ্ধির সাথে জি.পি.এ ৫ বাড়লেও তা আমাদের সফলতার পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, এর সংখ্যাই অধিক। সমস্যা সমাধান না হলে বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ পিছিয়ে যাবে। তাই গ্রামের প্রাতিক মানুষকে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার দিকে অনেক উৎসাহিত করতে হবে। এই জন্য আমাদের মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তারা তাদের এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক পর পর উঠান বৈঠকে যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে জন সমাজ আস্তে আস্তে শিক্ষার দিকে ধাবিত হতে থাকবে। এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মীমাংশা অনুষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার সুফলগুলো মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই শতভাগ উচ্চ শিক্ষায় পরিণত হবে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলসহ সমগ্র দেশ।

লেখক : অনার্স ১ম বর্ষ (পুরাতন), বাংলা বিভাগ, শিক্ষা বর্ষ : ২০২০-২০২১।



নিঃশব্দের সমাহার

অধ্যাপক ড. তাহমিনা খান

বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ



ও আকাশ আমি তোমার কাছেই
তোমার ঠিকানা চাই ...
দিনের আলো, রাতের কালো ধিরে
ঐ নিঃসীম শূন্যতার বৃন্তবলয় ছিঁড়ে
কোনো কোনো তারার রেখা ধরে
আমি চলে যেতে চাই দূরে
অনেক দূরের মহাশূন্যে ...
যে শূন্যকে শূন্য বলতে নেই
এক শূন্যতা স্থানে
আরেককে দেয় ছুঁয়ে
তবু মাঝের ফাঁকা একাংশে
আমার আমিটি রয় লেপটে
ইথারে সময় কথা বললে
সে নড়েচড়ে মাঝেমধ্যে ...
মনে হয় শূন্যস্থানেই
মহাশক্তির ফটোফ্রেমে
আমিটা গেছে লটকে
মেঘ নেই, ধূলোও নেই
কে তার আবরণ হবে
দাগ তো পড়বে না ছবিতে
এমন বোধহীন অবয়বে
শূন্যেই দৃষ্টি তার কটাক্ষে ...
ভাবনা তার পড়তে যেয়ো না কেউ
তাতে বিলীন না ফুরোনো
অনেক চেষ্টার চেউ
চায় সে ধূলোমাখা ছবিই হতে মর্ত্যে
জানে কোনো কোনো ফ্রেমে
ধূলোতেই প্রেম জমে
শূন্যের বাম বুকে বসা সংখ্যার আধিক্যে ...
সহস্র বছর পরের হন্দয়ই হাসুক না
লিখতে কী বাধা ! যে পত্রে নেই ঠিকানা ...

প্রাণ্তি

নজরুল ইসলাম খান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ



ভালোবাসার আবাদ কোথায়? চার্ষী হবো আমি
আমাজনের চারা এনে সাহারায় দেবো বুনি
যদি গজায় আগাছা চারহাতে দেবো নিড়ানি
রোমশ এ বুকে মুখ গুজে বলবে-
এত সুখ কোথাও তো পাইনি।

শেষ পাওনা

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ



নিঃসঙ্গতা ছুঁয়ে যায় দুঃখ নোনা জল
শূন্য পথের পথিক, খোঁজে মনোবল
এভাবে হারিয়ে সব, শেষ আয়োজন
জীবন প্রদীপ খোঁজে শুধু প্রয়োজন।

অলস দুপুর ডাকে, ফেলে আসা দিন
সময় ব্যস্ত এখন, দয়া-মায়া হীন
ধ্বনিত হয় না কিছু, প্রতিধ্বনির ভয়ে
জমাট বরফ শুধু, নীরবে যায় ক্ষয়ে।

নিঃস্তর যখন সব, থেমে যায় আশা
নিঃসঙ্গ মন তখন, মৃত্যু বাঁধে বাসা

নিখর নিঃশব্দে গেছে গন্তব্যে সবাই
ফেলে রেখে সবকিছু, সম্পত্য সদাই
ভোবে ভোবে বেলা যায়, এখন গভীর রাত
হিসাব পাওনা বাকি, শুধু সাড়ে তিন হাত।

চিরঞ্জীব পিতা

আনন্দ মোহন দে
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ



পিতা, তুমি ঘুমিয়ে আছো
টুঙ্গীপাড়ার নিঃত পল্লীতে
দেশ এগিয়ে যাচ্ছে
তোমার দেখানো পথেই নীরবে নিঃতে।

পিতা, তুমি চেয়েছিলে ক্ষুধাহীন
বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করতে
ক্ষুধা দূর হয়েছে
এখন আর কেউ না খেয়ে মারা যায় না
বৈষম্য যেটুকু আছে তাও
জেগেছে বাঙালি তোমার দেখানো পথে
দূর হবে দুঁদিন আগে কিংবা পরে।

পিতা, তুমি ঘুমিয়ে আছো
টুঙ্গীপাড়ার নিঃত পল্লীতে
জেগেছে বাঙালি তোমার দেখানো পথেই
নির্মিত হয়েছে তোমার স্বপ্নের যমুনা সেতু
নির্মিত হয়েছে তোমার বাড়ি যাওয়ার পদ্মা সেতুও।

জাতি হিসেবে বাঙালি নয় একটুও ভীতু
তোমার প্রয়াণ আমাদের স্বপ্নকে করেছিলো তেতু

পিতা, তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশ
হবে বিনির্মাণ

আকাশে বাতাসে-বিশ্বব্যাপী
প্রচারিত হবে শুধু তোমারই জয়গান।

পিতা, তুমি ঘুমিয়ে আছো
টুঙ্গীপাড়ার নিঃত পল্লীতে
তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশ
এগোচ্ছে তোমার দেখানো সঠিক পথেই।

সালাম পিতা তোমায়, সহস্র সালাম
শুধুই তোমার দেখানো পথে এ সমৃদ্ধ দেশ পেলাম।

শোষিত বঞ্চিতদের তুমি মৃত্যু প্রতীক
গরিব, দুঃখী, স্বাধীনতাকামীদের তুমি মিতা
বঙ্গবন্ধু তুমি চিরঞ্জীব পিতা।



সুখের আপেক্ষিক তত্ত্ব

যোবায়াদা সিদ্ধিকা
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ



সুখকে পেতে পার তুমি শুন্দি চিন্তনে
আর তোমার মনের ছিরতা আনয়নে।

সুখ পেতে পার তোমার নির্গুর্ধক ভাবনা পরিহারে
অথবা সদল বলে গিয়ে আনন্দ বিহারে।

যদি করতে পার অপরকে ক্ষমা
সুখ এসে হবে তোমার হৃদয় ভাঙারে জরা।

যদি কাজ হয় তব অপরের ভাল করা
সুখ পাখিটা এসে তোমায় দেবেই ধরা।

ক্ষেত্র ও বিদেশ থেকে থাকতে পারলে মুক্ত
সুখ এসে থাকবে যেন তোমার সাথে সদা যুক্ত।

রাগকে করে যথা সময়ে নিয়ন্ত্রণ
সুখকে তুমি করলে যেন নিজ ঘরে আমন্ত্রণ।

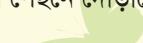
আপন ভাল কাজে থাকলে সদা ব্যস্ত
জেনো, তোমাকে সুখি রাখা সুখের হাতে ন্যস্ত।



থাকলে ভাল তোমার স্বাস্থ্য
ধরলেই এবার সুখটাকে দিয়ে দুহস্ত।

বাড়ি, গাড়ি, টাকা-পয়সা হয়তো দিবে সাময়িক সুখ
কিন্তু জেনো, এদের পেছনে দৌড়ানো তোমার মনের অসুখ।

সাময়িক সুখ নয়, স্থায়ী সুখ তুমি চাও পেতে
নিমফ চিতে প্রষ্টার আরাধনা তুমি পার করে যেতে।



শতবর্ষের ব্যবধানে

আতিকুর রহমান

সরকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ



এই বাড়িতেই ছিলেন তিনি, এই বাড়িটাই তার
শতবর্ষ ব্যবধানে এখন তিনি কোনখানে
কেউ জানে না কেউ ভাবে না
কেমন আছেন কেমন থাকেন
কী তার সমাচার।

কিছুকাল নির্ভেজাল, যদিও মায়াজাল
প্রতি ক্ষণে ভাবতো মনে-
আমার বাড়ি আমার ঘর
আমার জমি আমার চর
সামনে পিছে আমার লোক
আমার কথাই ধ্বনিত হোক।

চর দখল আর ভর দখলে পেত না সে ভয়
বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপুনাতে সব করেছেন জয়।

এপাড়

কেউবা ছিল ডানপকেটে কেউবা আবার বামে
কেউবা তারে বাহবা দিত, কেউবা আবার চামে
কেউবা তার দিনের সাথী, কেউবা ছিল রাতে
যখন তিনি ওপাড়ে গেলেন, কেউ যায় নাই সাথে।

নাতির ঘরের খুতি আছেন এই বাড়িতে ঠাঁই
দাদার দাদার নামটা তাহার জানা নাই।

পঁচে গেছে মাংস গাত্র, মুছে গেছে নাম
শুকিয়ে গেছে রক্তস্নাত ঘাম
এখন তিনি ঘুমিয়ে আছেন কোনখানে
কেউ জিগায় না, কেউ লয় না খোঁজ।

শত বর্ষ পরের ভবে
তুমিও একদিন হারিয়ে যাবে,
মনরে বলি বুবারে এবার বুবারে তুই বুবা।



ফিনিক্স বার্ড

মো. নাইমুল হাসান

প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ



আজও পরাজিত হায়েনার তাওব দেখি
আজও তাদের বিজয়োল্লাসে প্রকল্পিত হই।
পিতৃহীন ঘোল কোটি বাঙালির ঝুন্দন দেখি।

তবুও স্বপ্নাতুর আমি-

জেগে উঠো রেসকোর্সের ফিনিক্স বার্ড
ফুল পাখিরের কান্নায় হায়েনাদের উল্লাস
মানুষেরা সব শীতনিদ্রায়
পশুরা রয়েছে জেগে
ঝলসানো গোলাপের মতন
শুকিয়ে যাচ্ছে মমতা
পরিযায়ী পাখির মতন
ভালোবাসা আজ নির্বাসনে
শ্যামা আর শকুনে
মিলেমিশে একাকার
তবুও প্রতীক্ষায় আছি- জেগে উঠো ফিনিক্স বার্ড
আবার একটি বিপ্লবের প্রতীক্ষায়
আমরা ঘোল কোটি প্রাণ
তোমার বজ্জুকষ্ট শুনে লাশগুলো উঠে দাঁড়াক
পিতার মন্ত্রদীক্ষিত বিপুরীরা জেগে উঠুক
মানুষের সমুদ্র গর্জনবাহী
মিছিলে ভরে উঠুক রেসকোর্স
জেগে উঠো হে পিতা
জেগে উঠো, জেগে উঠো
টুঙ্গিপাড়ার ফিনিক্স বার্ড।



নদীর নাম বংশী

ড. আরমান হোসাইন আজম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ



অবিরাম জল

জলের জোয়ার ভাণ্ডে আঁধারের রাত
জাগে নদী জাগে নৌকা
আর দাঁড়ের সাথে জাগে বংশীর বুকে
মাঝিমাল্লার সচল দুটি হাত ।

কুমারের নাও কাঁঠালের নাও
পাটের নাও, কাঠ আর ধানের নাও
নাওয়ের ভিতর নীরবে বহে
ঘুমের মতো ছোটো ছোটো গাঁও ।

ছল ছল ছল
ছলাও ছলাও ছলাও
জল আর নৌকার গানে জাগে
বলবান দুটি হাতের বরাত ।

কে যায়? কারা যায় দূরের নায়
নিভু নিভু আলো ভাসে মৃদু বায়
কে বাঁজায় বাঁশি, ভাটিয়ালি গায়?

হাঁকে এ নায়ের মাঝি-
কোন বা তোমার গাঁও গো মাঝি
কোন বা ঘাটের নাও?

হাঁকে ও নায়ের মাঝি-
ঘাটেশ্বরীর নাও গো মাঝি
কাঁঠাল ভরা নাও
রাত পোহালে পৌছবো গিয়ে
হাট রামপুরের গাঁও ।

হাঁকে আর ডাকে
নদীর বাঁকে বাঁকে
ভাণ্ডে জলের ধার ।

কেহ ফিরে কেহ যায়
জাগে জগৎ জলের গান
নদী আর নৌকার সাথে
গভীর নিশীথ রাতে
জাগে বিরহী মায়ের প্রাণ ।

২.

আরে প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ রাসুল নাম
তারপরেতে একে একে জানাই গো সালাম
আহা সালাম জানাই মাতাপিতা আর শিক্ষাগুরু
সাঁদত আলীর কথা দিয়া জারি করলাম শুরু
শোনেন শোনেন টাঙ্গাইলবাসী
শোনেন দিয়া মন
সাঁদত আলীর কথা কিছু করি গো বর্ণন ।

আফগান অধিপতি ছিলেন সোলায়মান খান পন্নী
তাহার পুত্র ছিলেন এক বায়েজিদ খান পন্নী
রাজ বেশে গোড় কেশে করেন ভারত গমণ
সুনাম খ্যাতি যশে করেন বিশালো অর্জন ।

সাঁদদ খান পন্নী তাহার পুত্র আটিয়ায় নিবাস
১৬০৯এ সেথায় বাড়ান মসজিদের সুবাস
এই বংশেরই একাদশ পুরুষ সাঁদত আলী খান
করটিয়ায় আসেন তিনি রাখেন পন্নী বংশের মান ।

আহা সাঁদত আলী জমরংদুন্নেসা স্বামীত্বী জন
দুয়ে মিলে তাঁরা করেন সম্পত্তি অর্জন
যৌথ নামে দলিল হয় ভাই জানে সর্ব জন
ধর্ম, দানে অর্ধেক জমি করে গো অর্পণ ।

তেরতম পুরুষ হলেন ওয়াজেদ খান পন্নী
টাঙ্গাইলবাসী পেয়ে তাঁকে হয়ে যায় গো ধন্য
করটিয়ায় সাঁদত কলেজ তাহার অবদান
শিক্ষা দীক্ষা সকল কাজে বেড়ে ওঠে প্রাণ ।

এই পর্যন্ত জারি মোরা করছি সমাপণ
যাবার আগে সালাম জানাই যাহার অর্জন ।

কবিতাগুচ্ছ

মো. সাইফুল ইসলাম

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ



১.

সঙ্গগে
বাধিরও শুনে
মহাসমুদ্রে
ডাক

২.

সূর্যের আলো পানি বাতাসও আছে তো অনেক-ই মজুদ
দুনিয়ার কাছে চাই নাকো আর মুনাফা লাভের অসুখ

৩.

বিবেকে বিশ, আবেগে আশি
এই নিয়ে বাঙালির রাশি

৪.

শব্দই সক্ষট
নীরবতা খুলে জট

৫.

‘অপেক্ষা’ সে নানান চঙে
সকলকে নেয় জীবনসঙ্গে

৬.

মানুষের পতনেতে যদি হাসো খিলখিল
দুখেরা তখনি আসে দ্রুত হেঁটে পিলপিল

৭.

লোকেরে দ্যাখামু তাই ভাব নেই খুব
ভাবের আড়ালে জমে থোকাথোকা দুখ
দুখের এই কাহিনি যদি কও কাউরে
সত্য হবে না কিছু মন নষ্ট ফাউরে

৮.

গরু তুমি ভালোবাসো বড় বেশি ঘাস
না গুঁতিয়ে না লাথিয়ে পরো তাই ফাঁস

যে শিশুটির বয়স বাড়েনি

ফজলুল হক ফাহাদ
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



আইয়ুব খানের সেই দৃশ্যাসনের সময়
অনিচ্যতা আর অন্ধকারে চারিদিক অযোময়
বাঙালি জাতি মুক্তির লগ্ন পেতে দিঘিদিক
তোমার জন্মে ৩২ নম্বরে ছড়ালো আলো বিলিক।

পিতা রেখেছিল প্রিয় লেখকের মিতা নাম
বড় হয়ে বাড়াবে তুমি বাঙালির সম্মান।
কত আদর কত সোহাগের ছেউ তুমি
প্রশ্ন রেখেছিলে কারাগার কি আমার বাবার বাড়ি?

ঘাতকের বুলেট সেদিন মানবতাকে করেছে খুন
ছিলে বড় অভিমানী তুমি ভালবাসা বেড়েছে শতগুণ।
পিতা দেখেছিল শিশুটির মাঝে বাট্টাও রাসেলের ছায়া
যে শিশুটির বয়স বাড়েনি বেড়েছে শুধু স্নেহের মায়া।

জীবনানন্দ

লিপি অর্পিত
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ



জীবনানন্দ আজ লাশকাটা ঘরে
তুষার শুভ উষণ স্তনের মায়া ভুলে
পুষ্পিত অধর চুমোর মাদকতা ফেলে
জীবনানন্দ আজ লাশকাটা ঘরে ।

জীবনানন্দ আজ খুঁজে নাকো
পাথির নীড়ের মতো চোখ
কিংবা হেম, জীবনের সমুদ্র সফেন ।

জীবনানন্দ শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে
কোনো এক ট্রাম তারে সজোড়ে মারে
তারও আগে কত শত ট্রাম গেছে চলে
বুকের পাঁজর ভেঙে, উড়ে গেছে
শঙ্খচিল উৎকর্ষাসে ডানা মেলে
সাঙ্গ হয়েছে বনলতার চোখগুলো পড়া ।

জীবনানন্দ ঘুমাও তুমি লাশকাটা ঘরে
শেখাও মোদের জীবন ব্যবচেদের ছড়া ।

হাল ভেঙে শত নাবিক হারায়েছে দিশা
যুগের মাতাল হাওয়া লাগিয়েছে নিশা
তারই তোড়ে ভেসে যায় কতো শত জীবনানন্দ
পড়ে থাকে লাশকাটা ঘরে
কালের সাক্ষী হয়ে কতো শত জীবনানন্দ মরে ।

ইতিহাসের স্মাট

মোহাম্মদ আব্দুস সান্তার
শরীর চর্চা শিক্ষক, কীড়া বিভাগ



মুজিব মানেই ১৯২০ সালের
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া
মুজিব মানেই সায়েরা খাতুনের
আদরের সোনার টুকরা ।

মুজিব মানেই বাল্যকালের
সংগ্রামী ফুটবলার
মুজিব মানেই ত্যাগতিতিক্ষার
জগৎ সংসার ।

মুজিব মানেই প্রতিবাদী কঠুম্বর
“৭৫” এর কারবালা
মুজিব মানেই দুঃসহ শৃতি
দিবারাতি কাটে শোকের জ্বালা ।

মুজিব মানেই সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি
মুজিব মানেই জাতিসভা
ভাগ্যলাটের হাসি ।

মুজিব মানেই হিমালয়
কিংবা বঙ্গোপসাগর
মুজিব মানেই বিশ্বের দরবারে
বাঙালির হৃৎকার ।

মুজিব মানেই নন্দিত উষা
শিশুদের পূর্বাকাশ
মুজিব মানেই মানচিত্র
শিল্পীর তুলিতে আঁকা ক্যানভাস ।

মুজিব মানেই বাঙালির
দীপ কঠুম্বর
মুজিব মানেই গণজনতা
অবিচল অবিনন্দন ।

মুজিব মানেই ইতিহাসের
রাখাল রাজা
মুজিব মানেই রক্ত-সূর্য
বাংলার স্বাধীনতা ।

মুজিব মানেই জাতির পিতা
বাঙালির ললাট
মুজিব মানেই সমুদ্র-প্রাণ
ইতিহাসের স্মাট ।

ছেটসোনা

মো. রতন মিয়া

সাবেক আহ্বায়ক

সরকারি সাংদত কলেজ শাখা ছাত্রলীগ



মধুমতি নদীর তীরে
ছেটসোনা রাসেল এলো রে
মা ফজিলাতুন্নেছার উদরে
বঙ্গবন্ধুর ঘর আলোকিত করে।

রাসেলের সেই দুষ্ট মিষ্টি দুরন্তপনা
বাবা-মা ডাকে তারে বলে ছেটসোনা
ভাই-বোনেরা করে কত আদর
খেলার সাথী সবাই তারে করে অনেক কদর।

রাসেল আছে এই সোনার বাংলা জুড়ে
ফুল-ফসল, নদীর জল, পাখ-পাখালির ভিড়ে।
রাসেলকে পাই এখনো আমি ফিরে,
ধানমন্ডির বিশ্ব নামারের করিডোরে।

কলেজ স্মরণে

অনিক আনছৱী

সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক

সরকারি সাংদত কলেজ শাখা ছাত্রলীগ



চির শ্যামলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো কঠিনটে
হাজার আলোর রেখা ছাড়িয়ে তোমার সংস্পর্শে।
হন্দয়ে দোলায় তবু অরণে সহশ্র সৃতি
ক্যাম্পাস পানে মুখরিত নতুনত্ব প্রীতি
অনেক স্বপ্নের বুনো গাঁথা পুলকিত প্রাণ
সারা বাংলায় ছাড়িয়ে আছে হাজার কীর্তিমান ॥
পৃথিবীতে মোরা ধরতে পারি কলম স্যতে
জ্ঞান পিপাসু তৃষ্ণা মিটায় কলেজ পানে ॥
নিজেকে রাঙ্গিয়ে প্রকৃতির নানান রঙে
বনফুল দোলে কোকিলের ডাক বসতে ॥
নবীনদের কৌতৃহলী মনটাকে নিয়ে
অচলায়তন ভেঙে হাসো প্রাণ খুলে ॥

কিচিরমিচির শব্দে পাখি ডাকত

মোঃ সবুজ হোসেন

সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক

সরকারি সাংদত কলেজ শাখা ছাত্রলীগ



ঘূম ভাঙত রাতের শেষে
সূর্যের কিরণে জেগে উঠতে
তোমার প্রিয় বাংলাদেশে।
সফলতা কি বিফলতা কি
নাই বা বুরালে তুমি
তোমার বিনিময়ে আমরা পেয়েছি
তোমার প্রিয় জন্মভূমি।
নীতি আর আদর্শের স্বার্থে তুমি
নিজেকে করেছ ত্যাগ
তোমাকে মেরে আমরা পেয়েছি
সোনার সিংহ ভাগ।
তোমার দেশ আমাদের দিয়েছে
স্বীকৃতি আর পুরস্কার
তোমার ভাগে জুটল শুধু
মিথ্যা অপবাদের বুলেট ভার।

কী দরকার ছিল স্বাধীনতার
ভালোই তো ছিলে তুমি
তোমার বিনিময়ে আমরা পেলাম
তোমার প্রিয় জন্মভূমি।

তোমাকে মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু

মনির আনছারী

সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক

সরকারি সাংবিধানিক কলেজ শাখা ছাত্রলীগ



কেটে গেছে বেশ কয়েকটি যুগ

মনে হয় এইতো সেদিন

তুমি একটু করে ঘপ্পের মালা পড়িয়েছিলে বাঙালিকে

তোমাকে বলা হয়নি হৃদয়ের গহীনে

লুকিয়ে থাকা সহস্র কথা

তোমাকে যখন মনে পড়ে

আমি আমার বাংলাদেশকে দেখি

প্রতাকার দিকে তাকাই অবাক দৃষ্টিতে

তোমাকে যখন মনে পড়ে

কৃষকের মুখের হাসির দিকে তাকাই

তোমাকে যখন মনে পড়ে

মা মাটি মাতৃভাষা মাতৃভূমিকে বুকে আলিঙ্গন করি

এদেশের মাটি ঘাস বৃক্ষ তরঙ্গতা

তোমাকে চেনে

রাজপথ তোমাকে মনে করে

বেদনায় মুখ লুকায়

বিশ্বাস করো রেসকোর্স এর মাঠ

তোমাকে ভোলেনি

তোমার অবদান বাঙালি শ্রদ্ধা জানায় নত শিরে

তোমাকে অনেক কথাই বলার ছিলো

কেবলই তা এ দেশকে বলি

তোমার সাহসী দণ্ডকর্ত্ত

উজ্জীবিত রাখে শোল কোটি মানুষকে

হে বঙ্গবন্ধু, তোমাকে মনে পড়ে

স্মৃতির প্রতি পরতে পরতে ।

খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু

মমিতুল ইসলাম প্রমি

সভাপতি, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ

সরকারি সাংবিধানিক কলেজ শাখা



ইতিহাস কথা বলে

অভীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের

বাইর্গার নদীর তীরে বেড়ে ওঠা

প্রদীপ্তি যুবক

সে তো বঙ্গবন্ধু

ইতিহাস রচনা করে তাক লাগানো

বিশ্যাকর বালক সে তো বঙ্গবন্ধু

প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে

রাজপথ কাঁপানো বালক সে তো বঙ্গবন্ধু

খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্বনন্দিত

যার হাতে রচিত হয়েছিল একটি মহাকাব্য

যার প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্লে দেখি

কেবলি তার প্রতিচ্ছবি

যে মহাকাব্যের নায়ক তুমি

সুন্দর তুলিতে ঝঁকেছিলে একটি দেশ, বাংলাদেশ

বাহানা থেকে একান্তর

কলমে গর্জনে তর্জনীতে কেঁপেছিলো হায়েনা

বিজয় যার নেশা, অধিকার যার অলংকার

তাকে কে রুখতে পারে

সাড়ে সাত কোটির স্বপ্ন বুনেছিলে

সেদিন সতের মিনিটে

ইতিহাস কথা বলে

বঙ্গবন্ধু তুমি সেই বীর

যার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকতো অনাহারী

সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে যেত কৃষক

মা বোনের চোখে ও মুখে ফুটতো

তারার ন্যায় হাসি

তুমি সেই সন্তান

যার নামের উপর দোলে একটি মহাশব্দ স্বাধীনতা ।

মমতাময়ী জননেত্রী

লুৎফর রহমান

সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক

সরকারি সাংদত কলেজ শাখা ছাত্রলীগ

প্রভাতের সিংহদার পানে
হাজারো কুঁজের আহ্বানে
তোমার অক্ষয় কীর্তি উজ্জ্বল মুখে
এ বিশ্বের মাঝে এ বাংলার বুকে
তুমি মমতাময়ী তুমি জননেত্রী ।

ভেঙে গেছো তবু মচকাওনি
নতুন স্বপ্নে আপনার মনে
পুরিব একাকী,
মাঝের মুখে মাথা রেখে
চিরস্তন হয়ে থাকো হে আলোর দিশারী ।

তুমি অপূর্ব
পিতার তুমি সুযোগ্য কাঞ্চি ।



কালচক্র

রেনু আক্তার

এম. এ, বাংলা



বিমুক্তি আকাশ জানে পৃথিবী কত সুন্দর
বেঁচে আছি বলেই স্পর্শ করতে পারি অন্ধকার
নন্দিত আলো করতে পারি উপভোগ
বর্ণহীন ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে ।

সৌন্দর্যকে চাষ করতে পারি হৃদয়ে
সমাজ, রাষ্ট্রের ভ্রান্তিকে পড়তে পারি অনায়াসে;
প্রশ়া করতে পারি নিজেকে
সমাজকে রাষ্ট্রকে পারি না !

কল্পনায় কখনও সঙ্কটে পড়িনি
বাস্তবতা শিখিয়েছে জীবনের অর্থ
বারবার নয়, একবারই হেরেছি
কালচক্রের আঘাতে !

হে জাতির পিতা

আকলিমা

মাস্টার্স শেষ পর্ব, বাংলা



হে বঙ্গবন্ধু
আজ কবির ছন্দকে তুমি করেছ বিশাল
হে জাতির পিতা
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেলে চিরকাল ।
হে সৎপথ দিশারী
ভাষার গান আর সেখানে মুক্ত আকাশ
হে আলোক বাণী
হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে বাংলার বুকে ।
হে চির চৈতন্য
প্রতিবাদ উঠে সারা বাংলায় কৃষক শ্রমিক মিলে
হে কীর্তিমান
সহস্র সাহস পুলকিত নিশ্চলে অন্তরে অন্তরে
হে মুক্তিগামী
দিয়েছ স্বাধীন দেশ বাঙালির পানে ।

প্রকৃতির রাজ্য

আব্দুস সবুর

মাস্টার্স শেষপর্ব, ইতিহাস



রাজার বেশে ছিলাম মাগো
তোমার কাছে এসে
রাজার বেশে ছিলাম মাগো
তোমায় ভালোবেসে ।

তোমার কাছে
ছয়টি পরী দেখে ছিলাম
তাদের দেওয়া অনেক কিছু
আমার মাঝে রেখে ছিলাম
আমায় তারা বাসতো ভালো
যেনো দারণ হেসে ।

তোমায় ছাড়া
থাকবো আমি বলো কোথায়
সবাই জানি কেমন করে
সমস্যাটা হলো কোথায়
গেলেও তারা সঙ্গী হয়ে
রয়েই যাবো দেশে ।

ক্যাম্পাস

মীর শাহান আরা মেঘ
মাস্টার্স (শেষ পর্ব), হিসাববিজ্ঞান



এসো হদয়ের টানে
প্রাণের ক্যাম্পাসে
সকল স্থপ্তি আঁকি
হদয়ের ক্যানভাসে।

আর তোরা করিস না দেরি
বয়ে যায় বেলা
যেথায় শিক্ষা বিতরণের
অবারিত মেলা
শিক্ষকেরা নয় শুধু গুরু
তাদের কাছেই
ছাত্র-শিক্ষক বন্ধুত্ব জানার শুরু
লাইব্রেরির পাঠচক্রে
অনেক কিছু শিখি
অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠানে
অনেক কিছু জানি
বেলা অবেলায় মাঠের মাঝে
কখনো গল্প, কখনো কাজে
শহীদ মিনারে কত খুনসুটি
কথায় কথায় হেসে লুটোপুটি
নজরগুল কুটিরে
বাটুল গানের আসর
রেন-ট্রির ছায়ায়
কেটেছে কত অহর
কখনো বা ক্যান্টিনের সমুচ্চা, সিংগারা
আর গরম এক কাপ চা
সুই সুতা হাতে
শিউলি, পলাশ, বকুল ফুলের মালা
পুরুর পাড়ের টিপ্পি বাতাস
শীতের সকাল বেলা
ক্যাম্পাসের ওই আঙিনায়
থাকি কত শত বাহানায়
ওই ক্যাম্পাস নয় শুধুই আমার
ওই ক্যাম্পাস হল তোমার আমার সবার।

বঙ্গবন্ধু

মিঠুন সাহা
মাস্টার্স শেষ পর্ব, প্রাণিবিদ্যা



ভালবাসা শব্দটি অতি ছোট হলেও
এর পূর্ণত্ব অনেক।

তাহার মনের বাসনা ভাল
দেশমাত্কাও তারে বাসে ভাল
তাই যেন আজ দেশমাত্কার বীরসন্তান হয়ে উঠেছে
আমাদের বঙ্গবন্ধু।

রাজনীতিতে যখন আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল
মুজিব ভাই প্রবল প্রেমে বাংলার জঞ্জল পরিষ্কার করেছিল।
শিশুকাল হতেই মানুষের জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠতো
নিজের সব দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতো।
পাকিস্তানের জালেমদের অত্যাচারে মানুষ যখন নিপীড়িত
তখন মুজিব ভাই ছুকার দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালো
পরিবারের ভালবাসা তাদের সাথে সদা ছিল
বাঙালির বাঁচার দাবিতে তার জেলেই দিন গেল।

জেলে বসে জীবন-যৌবনের ৪৬৮২ দিন চলে গেল
কিন্তু একটি বিশ্বাসেই তিনি বলতেন
'তোমাদের ভালবাসাতেই আমি এতদিন বেঁচে আছি
আমি তোমাদের আছি তোমাদের থাকবো।'

কিন্তু কিছু দুঃস্থিতকারী
নির্মমভাবে সপরিবারে অবিসৎবাদী নেতা
শেখ মুজিবকে হত্যা করলো
নেমে এলো বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন কালো অধ্যায়।
তবে আমরা কি বঙ্গবন্ধুকে সত্যি ভালবাসি নাই?

বেসেছি তো
বাঙালির মনে আজও সেই ছবি আঁকা
বঙ্গবন্ধু ছাড়া যেন সবদিক ফাঁকা
তোমার স্মৃতি নিয়ে আজও আছি বেশ
ভালবাসার বঙ্গবন্ধু
এ আমার বাংলাদেশ।

তুমি ছিলে বলেই

কামরূপ হাসান
মাস্টার্স শেষপর্ব, দর্শন



তুমি জন্মেছিলে বলেই পেয়েছি
স্বাধীনতা।

তুমি জন্মেছিলে বলেই পেয়েছি
স্বাধীনতার পতাকা।

তুমি জন্মেছিলে বলেই পেয়েছি
মাতৃভাষা বাংলা।

তুমি জন্মেছিলে বলেই পেয়েছি
সোনার বাংলা।

তুমি জন্মেছিলে বলেই পেয়েছি
পদ্মা মেঘনা যমুনা।

তুমি জন্মেছিলে বলেই
গাইতে শিখেছি বাঙালির জয়গান।

তুমি জন্মেছিলে বলেই
শিখেছি ক্ষুধা নির্যাতন শোষণের বিরুদ্ধে সোচার হতে।

তুমি জন্মেছিলে বলেই
গড়তে পেরেছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

তুমি জন্মেছিলে বলেই
বাংলার শক্তিদের করতে পেরেছি বিনাশ।

আজ ১৫ আগস্ট তুমি নেই!
যারা তোমায় হত্যা করলো
তারা মানুষও নয় বাঙালিও নয়।

তুমি আর আমি

আব্দুল্লাহ হেল কাফী
সম্মান, ৪র্থ বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮



একই পথের পথিক মোরা
যুগল প্রেমের ধারায়
ঘপ্প মোদের আকাশ ছোঁয়া
নিবিড় গহীন মায়ায়।

অপলকে তোমায় দেখি
নয়ন দুটো মেলে
নিদ্রা দেশেও থাকো তুমি
আমার হৃদয় জুড়ে।

প্রহর কাটে তোমার আশায়
মিলবো মোরা কখন
থাকবে তুমি আমার পাশে
গল্ল হবে তখন।

সেই সন্ধ্যায় নীরব
যুগল পথিক বেশে
হাত ধরে হাঁটবো শুধু
হাজারো তারার মাঝে।

থাকবো মোরা জনম জনম
শতাব্দী পরে
চাঁদের আলোয় দেখবো মোরা
দুজন দুজনারে।

ইচ্ছে

খাদিজা নাজনীন

অনার্স চতুর্থ বর্ষ, বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

ইচ্ছে করে
নীল আকাশের
মেঘ হতাম যদি
ইচ্ছে করে
পাখির মতো
পাখা পেতাম যদি ।

ইচ্ছে করে
শিশির ভেজা
সকাল হতাম যদি
ইচ্ছে করে
রাতের আকাশের
তারা হতাম যদি ।

আরো অনেক
ইচ্ছে করে
সব কি পূরণ হয়
তাই তো বলি
ইচ্ছেগুলো
মনের ভিতর
চাপা পড়ে রয় ।



বর্ষা

লাভলী

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

এমনো ভরা বরষার প্রেমে পড়ে যায় সারা
প্রেময় রূপে ভরা গানে ভেসে আসে বর্ষা ।
আমার মন আজ পুলকিত আজ উন্নাদ
বকুল আর কামিনী ফুলের জোয়ারে
সন্ধ্যামালতি গেয়ে যায় গান আজি এ বর্ষায় ।
কালো মেঘে ভেসে যায় আর হঠাত করে বিজলীর
চমকানো বর্ষার অন্যতম সাক্ষী
সন্ধ্যার আগমনে ফিরে যায় নীড়ে বনের সকল পাখি ।
আমি গেয়েছি গান আর লেখেছি হাজারো কবিতা
সকল গান আর কবিতায় মিশে আছে নববর্ষার প্রথম কদমফুল ।



শেষ বেলার কাব্য

শ্রিয় সাহা

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, গণিত

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮



সেদিন যখন আবার বৃষ্টি নামবে
বুম বৃষ্টি
সেদিন তখন উঠোন জুড়ে বেলি গন্ধ ছড়াবে
খুব মিষ্টি
কিন্তু আমি থাকবো না
সেদিন যখন রূপালি জোছনায় স্নাত হবে রজনী
তার সাথে কামিনী
কিন্তু আমি থাকবো না ।

সেদিন যখন আবার কৃষ্ণচূড়া ফুটবে
আর বারে বারে পড়বে সবুজ ঘাসের বুকে
আর তার লালের মায়ায় জড়াবে তাকে
কিন্তু আমি থাকবো না ।

জানি, সেদিনও পলাশের লাল
রাখবে প্রতিটি বসন্ত ।

সেদিন আমাকে ছাড়াই এই সন্ধ্যা
মাতাবে রজনীগঙ্গা ।

তখন

আর শত ডাকলেও সাড়া দেব না

মহাকালের অনিবার্য আহ্বানে একদিন
হারিয়ে যাবো অনন্তকালে ।

সেদিন আর ভাগ বসাবো না
বৃষ্টি ভেজা বেলীর মিষ্টি গন্ধে
মাখবো না গায়ে রূপালি জোছনা
ডাকবো না কামিনী তোমায়
আর পোড়াবো না চোখ
কৃষ্ণচূড়া তোমার লালে ।

সেদিন খুব করে বৃষ্টি নেমো
আমি ভিজবো না
ঝরিয়ো জোছনা
আমি আর কাঁদবো না ।

প্রেমিকার ফুল

ফারিহা ইয়াসমিন

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, অর্থনীতি

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

তোমায় নিয়ে হাজারো কবিতা লেখবো আমি
তোমার রূপের সৌন্দর্যটা এতো সুন্দর আমার কাছে।

আমার ইচ্ছে ছিলো তোমায় নিয়ে যাবো গোলাপ গ্রামে
হাতে হাত রেখে ঘুরবো পুরো গ্রাম।

কেন না তোমার সৌন্দর্য গোলাপ এর মতো সুন্দর আমার কাছে
আমি জানি ইচ্ছেটা পূরণ হবে না তা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব।

তুমি গোলাপের কাঁটার মতো কাঁটা দিয়ে চলে গেছ
গোলাপ দেখতে যতোটা সুন্দর মনে হয়
তার কাঁটা তার থেকে বেশি ভয়ংকর।

গোলাপ দেখতে যতোটা সুন্দর মনে হয় ঠিক
তার সৌন্দর্যের মধ্যেই রয়েছে হাজারো কাঁটা।



মানুষ

মাহমুদুল হাসান সজীব

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, গণিত

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮



সমাজেতে আজ পড়িল এ কোন দৃষ্টি
চারিদিকে হাহাকার করিল অনাসৃষ্টি।

মানবজাতি খুঁজে আজ শুধু স্বার্থ
অথবা দোষে লাভ কি আমিও তো এক ব্যর্থ।

এ জন চাহে সরকারি আর সেজন চাহে গাঢ়ি
অবাক হয়ে আমি দেখি আর বলি মোর নেই বাড়ি।

যাহার ছিল তাহারি আছে থাকবেও জানি তার
এসব ভাবিয়া দিন পার করি আমি বারংবার।

বলে মোর হিয়া ওহে শোন মিয়া ভেবে করিও কাজ
সময় যায়ানি সুযোগটাও আছে লেগে পর তুমি আজ।

আমি বলি ভেবে কী জানি তা কবে সত্যের দেখা পাই
পেলে কভু নয় পাহাড় সমান সফলতাটাই শুধু চাই।

তবু জানি তা নয়কো সহজ এককুর্খানিও বটে
মানুষ যে শুধু মানুষই নয় দেখেছি সমাজ ঘেটে।

স্বার্থের তরে সবি পারে সে সত্যিকারের কথা
কিছু নীচু বাদে উঁচুদের তরে জীবনটা খানিক বৃথা।

আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোন
বলছি যা তা সত্যি কথা সন্দেহ নাই কোনো।

মানুষ তো জানি মানুমের তরে এমনটা কেন ভাব?
মানুষ আছে মানুষ নাই এটুকুই বলে যাব।



হৃদয়ে মুজিব

হৃদয় সূত্রধর

সম্মান, ৩য় বর্ষ, বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ
উৎপীড়কদের মাথায় পড়েছে বাজ
হয়েছে জন্ম সত্যের বান
সে তো তুমি শেখ মুজিবুর রহমান।

তুমি দেখিয়েছো স্বাধীনতা
করেছো লড়াই
তাই বাঙালি আজ
তোমাকে নিয়ে করে বড়াই।

তুমি কখনো করোনি আপোষ
করেছ সংগ্রাম
তাই আজও তুমি বাঙালির
হৃদয়ে অবিরাম।

ইচ্ছে ডানা

সুমি

অনার্স ৪র্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮



ইচ্ছে ডানা ভর করেছে
মেলতে যে চায় পাখা
কেমন করে মেলবে বল
নেই যে তার পাখা ।

কত কিছু ইচ্ছে যে তার
মনের মধ্যে আঁকা
মন আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে
সাতটি রঙের মাঝে
ইচ্ছে যে তার হাজার কিছু
স্পন্দন রাশি রাশি
সেই খুশিতে ভরবে যে মন
করবে তা ধিন নাচি নাচি ।

কোথায় সে ইচ্ছগুলো
হচ্ছে না পূরণ আদৌ
কেউ বা কারা করছে তাড়া
ইচ্ছে পূরণে দিচ্ছে বাধা
পারছে না আর আপন মনে
মেলতে যে তার পাখা ।

স্পন্দন যে আর হচ্ছে না তার
করছে আহজারি
আলোয় ভরা এই পৃথিবী
রয়ে গেলো বাকি ।

অভিমান

রায়হান কবির

সম্মান, ২য় বর্ষ, বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০



কেউ বলেনি অমন করে
আকুল গলায় ভালোবাসি
কেউ শোনায়নি অমন হাসি
মন করেনি বানভাসি ।

কেউ সাধেনি অমন সুরে
হৃদয় বীণে বাজিয়ে বাঁশি
কেউ জাগায়নি আবেগবাঁশি
নিবিড় মায়ায় জলোচ্ছাসি ।

কেউ বলেনি অমন করে
আমার চোখে দৃষ্টি রাখো
আমার ঘন্টে তোমার ঘন্টের
মাধুর্য রেখে যত্নে মাখো ।

স্পন্দলোকের গল্প ডোরে
সকাল সন্ধ্যা জড়িয়ে থাকো
যতো কষ্ট আছে দুঃস্পন্দের
ভালোবাসার চাদরে ঢাকো ।

কেউ বলেনি অমন করে
আউলা চুলে হাত বুলিয়ে
হারাই চলো তেপাত্তরে
সব পিছু টান যায় ছাপিয়ে ।

নেই পরোয়া নিন্দুকেরে
বাধার দেওয়াল সব ডিঙিয়ে
ভালোবাসর সিন্দু তীরে ।

ঘর বানাবো তোমায় নিয়ে
কেউ বলেনি অমন করে
তোমায় আমি ভালোবাসি
কেউ বলেনি অমন করে
তুমই আমার মুখের হাসি ।

বসন্তের সৌন্দর্য

মো. রায়হানুল হক

অনার্স ২য় বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০

সকল বৃক্ষ সেজেছে আজ নতুন ফুলে ফুলে
গাছে গাছে তাই পাখিদের বিচরণ
কচি পাতাগুলো বাতাসে উঠছে দুলে
প্রকৃতিতে যেন নতুনের আগমন।

কেন বা আজ প্রেম জেগেছে আমার মনে
তাহলে কি আজ এসে গেছে ফাণুন
মেতেছে আজ সবাই ফাণুনের গানে গানে
করা হবে ঝুরাজ বসন্তকে বরণ।

বসন্তের সৌন্দর্য যেন আমায় ডাকে
তারই সাজসজ্জা করতে উপভোগ
মন ছুটে যায় সেই মহিমার পরে
যেথে সৃষ্টি হয় হাজারো কবির শ্লোক।

সৌন্দর্য মনের তৃষ্ণা মেটায়
সৌন্দর্য বেঁচে থাকার আশা জাগায়।



অলীক স্বপ্ন

সুলতানা আক্তার সুমি

অনার্স, অর্থনীতি

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭

দূর জন্মের ভাবনাগুলো
দূরে পরেই থাক না এবার
দূর জীবনের গল্প না হয়
দূর জন্মের কান্না-হাসা
বিরহ প্রেম ভালোবাসা
ডায়েরিতে সব লেখা থাক।

কবিতায় সব গাঁথা থাক
এ জন্মে আমি তোমার
প্রেম সাগরের চেউ হবো
হাদ মাঝারে নাই বা থাকি
দূরত্বেও পাশে রবো।

আকাশ সমান প্রেম হবো
সাতরঙ্গ এক স্বপ্ন হয়ে
নিশ্চীথে প্রদীপ জ্বালবো।



চির কাঞ্জিক্ত বৃষ্টি

সোলায়মান সিয়াম

অনার্স ২য় বর্ষ, বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০

দুঁটো ফসল ফলাতো যে চাষা
এক পশলা বৃষ্টির প্রতীক্ষায়
দিগন্তে তাকিয়ে ছিলো শুক্ষ মুখে
সে এখন ক্রুদ্ধ চোখে মেঘের দিকে তাকায়।



উঠোনে ছড়ানো শুকনো শুকনো ফসলে
বৃষ্টি আজ মহা অভিশাপ
হয়তো সে চাষা স্বার্থহীন
বৃষ্টি কামনা করেনি কখনো।

আমি বৃষ্টি চাই উদরের ক্ষুধা নয়
চিত্তের ত্রুষ্ণা মেটাবো বলে।

চেত্রের দুপুরে হোক বা মাঘের সকালে
পথে-ঘাটে বা রোদে দেওয়া শস্যে
ঠান্ডা কিংবা জ্বর আক্রান্ত শরীরে
সে বর্ষণ আমি মাথা পেতে নেবো।

বৈষম্য

নীলা আক্তার

অনার্স ১ম বর্ষ, ইতিহাস

শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২



সমাজের রঞ্জে রঞ্জে
দূরারোগ্য ব্যাধির মতো
গ্রাস করছে সামাজিক মূল্যবোধ।

বৈষম্য নামক ঘৃণপোকার কামড়ে
ক্ষত হচ্ছে শত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী
লালচে রক্তকণিকার মানুষরাই
কেন এই সাদা কালোর পার্থক্য টানি?

ফের বলবে ভদ্র সমাজ, আছে ঐক্য
উপস্থাপন করবে সহস্র কথা
তবুও বলবো আমি, কমেনি বৈষম্য
দৃষ্টিভঙ্গিতে দমেনি অসমতা।

খুব জানতে ইচ্ছে করে

তাওহীদুল ইসলাম (তাওহীদ)
প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান



একান্তরের ১৬ই ডিসেম্বর
বিজয়ের পরশ পেয়ে
সেদিন কি সবাই হাসছিল
নাকি সজন হারানোর ব্যথা
চোখের জলে গড়িয়ে পড়ছিল
খুব জানতে ইচ্ছে করে ।

“মা আমার দেশটাকে হানাদারদের
হাত থেকে বাঁচাতে হবে”
বলে যুদ্ধে যাওয়া ছেলেটা কি
ফিরে এসেছিল মায়ের কোলে
খুব জানতে ইচ্ছে করে ।

ছেলে হারা মা কি তার
সন্তানের লাশ খুঁজে পেয়েছিল
নাকি স্বাধীনতার মাঝেই
সন্তানকে খুঁজে নিয়েছিল
খুব জানতে ইচ্ছে করে ।

রক্তমাখা ছেলেকে দাফন করতে গিয়ে
বাবা কি হাইমাউ করে কাঁদছিল
নাকি শহিদ ছেলেকে নিয়ে
গর্ব করে হাসছিল
খুব জানতে ইচ্ছে করে ।

স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকা
স্ত্রী কি লাল সবুজ শাড়ি পড়েছিল
নাকি সাদা শাড়িকেই সেদিন
আপন করে নিতে হয়েছিল
খুব জানতে ইচ্ছে করে ।

শীতকাল

মো. সেলিম হাসান
১ম বর্ষ, বাংলা



শীত এলেই মনে পড়ে
ভাঁপা পিঠার কথা
সকালবেলা খেজুর রস
থেতে কী মজা !

কুয়াশায় চারদিক
থাকে যে ঘিরে
শিশির ভেজা ঘাসের উপর
হাঁটতে ভালোলাগে ।
শীতকালে অতিথি পাখি
দেখা যায় বাংলার বুকে
সাইবেরিয়া থেকে তারা
বেড়াতে আসে ।

কত মানুষ শীতের কষ্টে
মারা পড়ে
শীতকালে শহরের মানুষ
অলস হয়ে যায়
সূর্য মামা না হাসলে
জাগতে নাহি চায় ।

শীতকালে কষ্ট হয়
পথ শিশুদের
বন্ধুহীন রাত্রি কাটায়
ফুটপাতে শোয় ।

ভাষার জন্য বাঙালি

নীলা আঙ্গার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



হাজারো ভাই বোনদের প্রাণ
কেড়ে নেয় পাকিস্তান।

তবুও বাঙালি পরাজয় মানেনি
ভাষার জন্য কম খাটেনি
অত্যাচার সহ করে
দীর্ঘ সময় ধরে
ভাই বোনদের তাজা রক্ত দিয়ে
এ দেশ এনেছে রাঙিয়ে।

সন্তান হারা মায়ের কষ্ট হয়
এ কষ্ট যেন শেষ হবার নয়।
মায়ের মনের ভয়
ফেরুজ্যারিতেই যেন শুরু হয়।

শত বাধা পেরিয়ে-
সামনে যাব এগিয়ে
লাখো শহিদের রক্তস্মৃতি
আমাদের মনে রাখব গাঁথি।

মালঞ্চ

মো. আহাদ খান

অনার্স ১ম বর্ষ, বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



পথ পেরিয়ে এখানে
ঘর বেঁধেছে মাধবীলতা
দিঘির জলে নোনা ব্যথায়
জন্য হোক শ্রিয় পদ্মপাতা
ভেজা ঘাসের উপর রাতে
নেমে আসে আকাশের তারা
বনে জোছনার ছোট চারা।
কড়ি গাছের ডালে পাখিরা
গান ফেলে গেছে হাহাকার
ঘরে ফিরে বন্ধ করে দ্বার
প্রেম নয় শুকনো জবার
বুক চিরে তৈরি হোক মালা
এসো সবাই মিলে ভরি
মালঞ্চ ফুলের ডালা।

প্রথম বৃষ্টির আনন্দ

তরিকুল ইসলাম তারেক

সম্মান, ১ম বর্ষ, গণিত



আকাশ হয়েছে কালো
বাতাস ছুটেছে মেঘ জমেছে
আনন্দে দিশেহারা যত তৃণলতা।

ব্যাঙ ডাকছে বৃষ্টি হচ্ছে
খুকি ভিজছে খোকা ভিজছে
দাদুর হাতে ছাতা।

জেলে যাচ্ছে মাছ ধরিতে
খুশি জেলের পিতা
তাই দেখিয়া কাঁদছে মাছের মাতা
আজকে হবে শিকার
কে করিবে আজ বিস্তার।

ঘুম ফুরিয়েছে শামুক চলছে
উঠেছে ব্যাঙের ছাতা
ঘপ্প দেখেছে মাঠ ভিজছে
খুশি কৃষক পিতা
গরুর কাঁধে জোয়াল বসিয়ে
হাঁটছে কৃষক দাদা।

সুতার পাড়ায় কাঠ চিরাচ্ছে
কামার পাড়ায় লোহা
মাঝি যাচ্ছে বৈঠা নিয়ে
নৌকা ভাসছে তীরে
বৃষ্টি সুখের আনন্দে আজ
সুর উঠেছে নীড়ে।

অজানা অম্বর

শারমিন

অনার্স ১ম বর্ষ, সমাজকর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২



দীপ্তমান আলো

রয়েছে অম্বরে, রঞ্জনীর আঁধারে

নভমগুলের তলে

সেখায় আবেগ শ্রতি

স্ব স্ব জাতি

নীহারিকা ছিল তাদের পাশে

মনুম্যরা অস্তঃকরণ

করেছিল তাদের সাথে

নিশ্চার মায়া নিয়ে

করতো খেলা

নিষ্পাপ চিত্তে

খুলে দিত জাদুর মেলা

জুড়াইয়া যাইতো আঁধি

দেখিয়া ললিত অম্বরাক্ষি

এখনও আছে সেই

পুষ্পরস অমরায়

যদি চক্ষু তাকে দেখিতে চায়?

লুপ্ত আছে সেখায়

মনু-প্রণীত হাজারও বচন

শুনিতে যদি চাও

নির্মল চিত্তে ভাবনায়

ডুবিয়া যাও

লক্ষ্যাধিক রূপে উঠবে ভেসে ছায়া

অন্যথায় হাজারও রকম মায়া

সেখায় স্নান করো না

ডুবে যাবে চির অতলে

অম্বরের রহস্য অজানা থাকবে

চির জীবন ধরে।

১৫ই আগস্ট

মো. ইমন তালুকদার

সমাজকর্ম

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



সেদিনের সেই কালো রাত্রি

জঁোনাকি দেয়নি আলো

চাঁদ দেয়নি জোঞ্জা

হয়নি পাথির ডাক শোনা

হয়নি নতুন সকাল দেখা।

ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বাড়ি

সেই রাত দিয়েছিল মুজিব পরিবারের সাথে আড়ি

বাংলার বুক থেকে মুজিব পরিবার নিল কাড়ি

মুজিব সিঁড়িতে মাতা মেঝেতে

জীবন দিল রাসেল কামাল জামাল আরো সঙ্গী

কে দেখে তখন হায়নাদের রঙচোষা সেই ভঙ্গি?

আজো মনে পড়ে বাঙালির সেই কথা

মুজিব তুমি বাঙালির জীবনে গাঁথা।

বারবার প্রতিবার প্রতিটি বছর

মনে পড়ে সেই কথা সেই ১৫ই আগস্টের ব্যথা

বাংলার বুকে মুজিব জীবন দিয়েছিল যেথা

মুজিব তুমি চির অমর বাঙালির কাছে

হায়নারা সপরিবারে হত্যা করেছিল আজো মনে আছে।

মুজিব তুমি প্রতিটা বাঙালির বুকে মুখে গাঁথা

ভুলতে পারি না মোরা ১৫ই আগস্টের ব্যথা।

আমার বন্ধু

আরিফ হোসেন

অনার্স প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



প্রথম দিন ক্লাসে পা রাখতেই
মিঠুন লিটন হাসানকে পেয়েছিলাম।

আমির নামক এক ছেলে তখন ছিল বড় স্মার্ট
মনে হতো তামিল মুভির নায়ক দেখে গা জুলত
তারপর অনেক কিছু ঘটে গেল
সেও বন্ধু হয়ে গেল।

আশিক ছিলো আলাভোলা
মরিয়ম মিতু রহিমা ছিলো যেন নায়িকা
হাসিয়া বিথী সুবর্ণাও ভীষণ দূরদর্শী ছিলো।

আর মিঠুন ছিলো সে সময়ের আত্মার-আত্মীয়
আমির হয়ে গেলো বেস্ট ফ্রেন্ড
মাহমুদা ছিলো ভীষণ লাজুক
আঁখি সে ছিলো ভীষণ মোটা।

লিপীকে দেখতে হলে আকাশের দিকে তাকাতে হতো
শারমিন এখন এক ছেলে-দু'মেয়ের মা
বন্ধুদের 'ও' ভুলেই গেছে
আর শিল্পী
সে তো কবেই সংসারী হয়ে গেছে।

তানিয়া?
মেয়েটা অনেক কষ্ট করেও
স্বামীর সংসারে সুখী হতে পারছে না।

শাকিল মন্দলের সাথে পরিচয়
সে ছিলো তখনকার নামকরা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট।
অঙ্ক ছিলো সে সময়ের প্রেমিক পুরুষ
সিমু সরকারি চাকরিজীবী স্বামী পেয়ে
বেশ সুখেই আছে।

হৃদয়, সুজয় এদের না ক্ষ্যাপালে হয়তো
ক্ষুলজীবন বৃথায় যেত
আল-আমিন যে কি না ক্যামেন্ট্রির
সবগুলো মৌলের নাম
অনড়গল বলে দিতে পারতো।
ইলিয়াস ছিলো বড় হাতি খেতো বেশি।
কষ্ট পেলাম
কাল নাকি শিল্পার বিয়ে!
আচ্ছা হৃদয় (পাগলা) কে সবাই ভুলে গেছি?
যাকে পাগলা বললেই খেপে যেত
মনির তো ছিলো সালমান শাহ
আর আকাশ নাজমুলকে মনে হতো এক রক্ত
এরা দুজনেই এখন কর্মজীবন নিয়ে ব্যস্ত।
লম্বু ছয় ফুট মিষ্টি লাউ হাবিবুর
সে এখন প্রবাসী
সৌরভ ছিলো হাসিখুশি
মুন্না, ইয়ানুর সবাই ছিলো কিংবদন্তি
শরীফ (চিনি বাঁশ) সব স্মৃতিই মনে আছে।

সাকিব ছিলো চিকন আলী
ক্লাসের ধার্মিক ছিলো আরিফুল
আর আবিদা ছিলো যেন
কবি জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন
সোমা তো এখন নববধূ
সাবিনা এক ছেলের মা
শরীফার সাথে এখন আর যোগাযোগই হয় না।

রিপন মামা ছিলো বড় চাপাবাজ
মেহেরাব তো এখন বড় নেতা।
অন্তর সঙ্গী এরা তখনকার সেরা ক্রিকেটার।
জেসমিন তো ছিলো রানি এলিজাবেথ

এরা সবাই আমার বন্ধু
কাউকেই ভুলি নাই
আর ভুলতে চাইও না।

দাফনের দিনে

মো. নাস্তি আহমেদ

অনার্স ১ম বর্ষ (পুরাতন), বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



মৌমাছি সূর্যমুখী ফুলে
মধু আহরণে বের হয়ে
উড়ে যাচ্ছে সে শান্তির
বাতাসে স্বাগের সাথে বয়ে।

চিয়ে পাখি ঝাঁক যাচ্ছে
অনাবাদি জমির উপরে
যেখানে গরু ঘাস খাচ্ছে
একপাশে পুকুরের পাড়ে।

আছরের সালাতের শেষে
ভিড় করেছে বুড়ো যুবক
সকলের মনের কামনা
জানায় এবার শেষ হোক।

লাশকে দেখতে এসেছে কে?
হাতে গোনা ক'জন মানুষ—
ওরা আসে লাশকে দেখাতে
ওদের নাই বুদ্ধি-হৃঁশ।

ভিড় জমেছে কবর ঘিরে
বাঁশের বেড়া চারাটি দিয়ে
দিনের শেষে সন্ধ্যা হলো
চলো বিশ্রাম করি গিয়ে।

ফিরে আসবো নানান বেশে

মাহবুবা খান সিমা

অনার্স, ইংরেজি

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০২০



হয়তো ফিরে আসবো
আবার অবনী পরে
ফিরে আসবো আমি
কখনো ভোরের শিশির হয়ে
কখনোবা বর্ষাকালের বৃষ্টি আকারে
মাঝে মাঝে সাদা-কালো মেঘ হয়ে।

কখনো রাতে আকাশের
অজ্ঞ তারা হয়ে
কখনো প্রিয় ফুল বকুল রূপা
কখনো বা পুরো এক
পুষ্পকানন রূপে।

না হয় কোনো
তরঙ্গনীর উর্মিমালা হয়ে
না হয় আসবো
বাংলা মাঘের শাড়ির আঁচল হয়ে।

হয়তো বা ফিরে আসবো সেদিন
নীল আকাশের নিচে
এলোমেলোভাবে আপন মনে উড়ে চলা
একদল প্রজাপতির বেশে।

তুমি আমার সারাবেলা

মেহেরুন

অনার্স ১ম বর্ষ, পদার্থ

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



তুমিহীন আমি

একলা বেশ আছি ।

তুমি আছ তোমার মতো

আমিও আছি আমার মতো ।

কোথাও একটা আছ তুমি

আমার হৃদয় জুড়ে ।

তোমায় নিয়ে ভাবনার নেই শেষ

তুমি আমার বিকেল

তুমি আমার সন্ধ্যাতারা

তুমি আমার নিষিদ্ধ ভালোলাগা

নিষিদ্ধ ভালোবাসা ।

তোমায় নিয়ে আমার যত ভাবনা

কোথায় আছ তুমি?

কবে দেখবো আবার তোমায়?

তোমার সাথে দুদণ্ড বসে করব গল্প বেশ

তুমি কি সেই আগের মতোই বুবাবে আমাকে?

নাকি ভূলে গেছ এই তোমার আমিকে?

কত অপ্প সাজাই তোমার আমার

হলো না তা বলা

না বলাই থাক কিছু অব্যক্ত আশা

হবে না আর বলা ।

ভালো লাগে

শিরিন শিলা

ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২



রাজার সিংহাসন থেকে নয়

নয় হিমালয়ের পাদদেশ থেকে

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে নয়

আমার হৃদয়ের ছোট কুটির থেকে বলছি

ভালো লাগে সবুজে ঘেরা এই সাঁদত কলেজ ।

ভালো লাগে কলেজের ফুলের বাগান

ভালো লাগে কলেজের ক্যাম্পাস মাঠ

ভালো লাগে মাঠের পাশে সুন্দর পুকুরটি ।

ভালো লাগে সিনিয়রদের স্লেহ ও ভালোবাসা

ভালো লাগে শিক্ষকমণ্ডলীর আমাকে আপন করে নেওয়া

ভালো লাগে আমার ইসলাম শিক্ষা বিভাগের

প্রফেসর হুমায়ুন করিব স্যারকে

ভালো লাগে নাইয়ুল হাসান নাসির স্যারের

মনোরম “ইসলাম পরিচিতি” ক্লাস করতে

আরো ভালো লাগে আমার সহপাঠীদের অমায়িক ব্যবহার ।

পথিক দাঁড়াও

মো. ইমন খান

অনার্স ১ম বর্ষ, গণিত

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



বোকা ছেলে বোৰো না

পৃথিবীটা রহস্য— সবই এক ছলনা।

মায়াবী লাগবে সবই, বয়সের দোষ সব
সুশীল এ জীবনেতে করো নাকো কলরব।

যেন সুখ ধরে হায় আঁখির এই পলকে
মনে করো ফেঁসে গেছো নন্দিত নরকে।

মায়াময় এ দেহেতে কতশত সঞ্চি
যেও নাকো হারিয়ে হয়ে যাবে বান্দি।

তুমি যাকে প্রেম বলো আমি বলি স্বার্থ
ভালোবাসা মানেই তো সুবিশাল দায়িত্ব।

স্বার্থের সঙ্গে মিলিও না প্রেমকে
আগে বুরো প্রেম কি তারপর তোমাকে।

প্রেমের এক কারখানা নাম তার জান্নাত
পারবে না ছুঁতে তারে অশীল খাহেশাত
প্রেমের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন ঈশ্বর
ইহাই মানিয়া লও বাকি সব পড়ে থাক।

যেন যাও ভুলে তুমি শয়তান মোতায়েন
বলেছিলো কানে কানে প্রেমিকারে বলিয়েন।

বয়সের দোষে আজ দ্বারে ঠুকে খাহেশাত
হারাম তরুণ ভাই হাতে রাখো তার হাত।

তাহাই সত্য যাহা বলেছেন স্বৰ্ণস্তা
মহান রব তিনি একক সর্বদ্বন্দ্বস্তা।

শৃঙ্খল থেকো তুমি দুনিয়া দুই দিনের
নিয়ম ভেঙ্গো না তুমি আল্লাহর জমিনের।

মায়া

সাদমান হাফিজ শুভ

অনার্স ১ম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১



সবুজ মোদের দেশ

সবুজ ভালোবাসি

ইউরোপ যাই আমেরিকা যাই
এখানেই ফিরে আসি।

সবুজ মোহে পক্ষীকুল

গায় মায়ার গান

মায়ার টানে সর্বজনের
জুড়ায় মন ও প্রাণ।

এমন মোহ এমন মায়া
কোথাও নাহি পাই
জনম জনম ধরে তারে
ভালোবেসে যাই।

ভালোবাসার টানে এথা
রাখি গভীর দৃষ্টি
তাই তো দেশে বারে সদা
সম্মীতির বৃষ্টি।

সম্মীতির শক্ত গিটে
বর্গি পালায় দূরে
শান্তি ছায়ার কোমল হাওয়া
সবার হৃদয় জুড়ে।

শান্ত ছায়ায় বেড়ে উঠে
ছোট কোমল প্রাণ
দেশ-বিদেশে গেয়ে বেড়ায়
মানবতার গান।

পুরুষ

ইসবাদ আল-জামি

আজ তুমি কোট-টাই পরা সুশীল সমাজের
কথিত সুশিক্ষিত ভদ্রলোক
তুমি পুরুষ ।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলেই
তোমার ভাষায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে
লালসাময়ী ক্ষুধার্ত হিংস্র হায়নার রূপ
তুমি পুরুষ ।

তুমি সুশীল সমাজের কথিত সুশিক্ষিত ভদ্রলোক
তুমি পুরুষ
এক টুকরো কচি মাংসপিণ্ডের লোভে
তুমি হয়ে উঠতে পার মানুষরূপী এক নরপিশাচ
তুমি সুশীল সমাজের কথিত সুশিক্ষিত ভদ্রলোক
তুমি পুরুষ ।

আজ তোমার লালসার হাত থেকে বাদ যায়নি
সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কিশোরী
বাদ যায়নি যৌবন বাতী মাঝবয়সী নারী
বাদ যায়নি দুঃখপোষ্য কন্যাশিঙ্গুটি
বাদ যায়নি যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া বৃক্ষাটিও ।
তবুও তুমি সুশীল সমাজের কথিত সুশিক্ষিত ভদ্রলোক
তুমি পুরুষ
হ্যা, তুমিই পুরুষ ।



মাহে রমজান

মো. ইদ্রিস আলী বাগান মালী



বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান
কবরের সাথী হইবে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান ।

পরকালের সাথী হইবে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান ।

হাশরে সাথী হইবে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান ।

মিজানের সাথী হইবে মাহে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান ।

পুল সিরাতের সাথী হইবে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান ।

নাজাতের বানী নিয়ে এসেছে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান
বারে বারে ফিরে আসে মাহে রমজান ।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপহার পরিত্র রমজান ।



ଗଲ୍ପ



স্বপ্নের বাবু

মোঃ আজিজুর রহমান (বিপ্লবী বাবলা)

উৎসর্গ: প্রাণপ্রিয় কন্যা তাসনিয়া রাহমান তাসিন ও তার মাকে

দিবসের ক্লান্তি শেষে দুঁজনে ঘুমাতে যাচ্ছি। দুঁচোখে ঘুম ঘুম ভাব, তবু কেন জানি ঘুম আসছে না কিছুতেই। কী যেন, কেমন যেন এক মোহনীয় স্বপ্ন এমে ভর করেছে দুঁজনেরই চোখের পাতায়। দুঁজনে সেই সুদূরের স্বপ্ন জগতের কতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি, আবার কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছি না। কী অঙ্গুত রহস্যময় জীবন— কী বিস্ময়কর স্বপ্নে আচ্ছন্ন অনুভূতি! খরশোতা নদীর মতো কী মধুর প্রবহমানতা! আবার কী বেদনাদায়ক বোবা নিষ্কৃতা! সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তাই শুধু জানেন এসবের মর্মভেদী রহস্যগাথার নিভৃত প্রশ্নেতর।

এভাবে দিন যায় রাত আসে। রাত যায় দিন আসে। সূর্য উদিত হয় আবার সূর্য অন্ত যায়। আঁধার আসে, আঁধার ভেদ করে চাঁদ ওঠে। ধরিত্রীব্যাপী আলো বিচ্ছুরিত করে সেই চাঁদনী রাত তার প্রশান্ত মায়াবী স্পর্শে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায় স্বপ্নে বিভোর দুই মানব-মানবীকে। নতুন সূর্যোদয় পর্যন্ত গভীর প্রতীক্ষা যে স্বপ্নের। অথচ কেন জানি কিছুতেই শেষ হতে চায় না সে স্বপ্ন। কবে সফল সমাপ্তি ঘটবে আমাদের স্বপ্নের? গাঢ় রাতের নিষ্কৃতা ভেদ করে মৃদুস্বরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন বিস্ময়কর মেধাবী সায়েন্টিফিক অফিসার নীলুফার চৌধুরী।

আমিও সেটাই ভাবছি, কবে সফল হবে আমাদের সোনালি স্বপ্ন?

উত্তর দেন বুদ্ধিমুক্ত প্রফেসর এ.আর. রাহমান।

আমাদের বাবুটা কি চিরকাল বাবুই থেকে যাবে? ও কবে বড় হবে, অ-নে-ক বড়!

তাই তো! আমারও তো একই প্রশ্ন, কবে বড় হবে আমাদের বাবুটা?

মায়ের বুকের গভীর মায়া মমতায় জড়ানো প্রাণপ্রিয় বাবুটার মাথায় স্বপ্নেহে হাত বুলাতে প্রশ্ন করেন প্রফেসর এ.আর. রাহমান। ঘুমন্ত বাবুটাকে অসীম আদর সোহাগ ও স্লেহ-মমতার বাঁধনে জড়িয়ে রাখছে তার প্রিয় মা-বাবা। তারা লাল পরী নীল পরীর গল্ল কিংবা মিহিসুরে ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসির সুমধুর গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে তাকে। ঘুমিয়ে যাচ্ছেন তারা নিজেরাও। মানব জীবন ও স্থানকাল বা স্পেস-টাইম সৃষ্টিকর্তার এক অন্তর্হীন রহস্যের আধার। সৃষ্টিকর্তার অদৃশ্য ইশারায় অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায় মানবজীবন, এগিয়ে যায় স্পেস-টাইম, এগিয়ে যায় মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ। অসীম কর্মপ্রবাহের জগতে অসংখ্য নর-নারীর ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কর্মকাণ্ডের মাঝে নীলু-রাহমান দম্পতির দৈনন্দিন কাজকর্মও থেমে নেই। বাবুটাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সকালের নাট্য করিয়ে মর্নিং-স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে তার মা। কিন্তু হঠাৎ অকল্পনীয় অবাক কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করলো তাদের জীবনে। যা অনুভব করতে করতে শিহরিত রোমাঞ্চিত হতে থাকে তাদের সবার মন-প্রাণ। বাবুকে স্কুলের ক্লাসে প্রবেশ করানো হলো। বাবু ক্লাসে গিয়ে বসলো। হঠাৎ মুহূর্তমধ্যেই কোনো এক অজ্ঞাত জাদুকরের মহাবিস্ময়কর জাদুর ছোঁয়ায় পৃথিবী কঁপিয়ে, জল-স্তুল-অতরীক্ষ ভেদ করে সুদূরের অসংখ্য গ্রাহ-নক্ষত্রের বুক চিরে অঙ্গুত এক ঘট্টা ঢাঁচ করে বাজতে লাগলো! শো শো শব্দে দ্রুত বেগে বইতে শুরু করলো একটি বিস্ময়কর দ্রুতগতিসম্পন্ন আকাশছোঁয়া ঘড়ির কাঁটা। বিধাতার অদৃশ্য ইশারায় বদলে যেতে শুরু করল স্পেস-টাইম এবং সবকিছু। মুহূর্তমধ্যেই বেবি ক্লাসের বাবুটি সব ক্লাসেই ফাস্ট হয়ে ক্লাস ফাইভে উঠে গেলো। পর মুহূর্তেই বিস্ময়কর ঘড়িটার শো শো শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে চোখের পলকেই কৃতিত্বের সাথে ক্লাস সিঙ্গা, ক্লাস সেভেন, ক্লাস এইট, ক্লাস নাইন উন্নীর হয়ে গেল। শুধু তাই নয় এস.এস.সি পরীক্ষায় বোর্ড স্ট্যান্ড করলো সে। অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপনিষিতে বিশাল জনসমাবেশে কৃতী-শিক্ষার্থী পুরক্ষারের মুকুট পরলো বাবুটি। বাবুর অসামান্য কৃতিত্বে কী যে অপার আনন্দ তার মা-বাবার বুকে তা অর্ণবামী সৃষ্টিকর্তাই জানেন। কিন্তু একি! এসএসসি শেষ হতে না হতেই মুহূর্তের মধ্যে বাবু বোর্ড-স্ট্যান্ড করে আবারো কৃতিত্বের সাথে অতিক্রম করে ফেললো জীবনের আরেকটি ধাপ- এইচএসসি। এবার উচ্চশিক্ষার পালা। বাবু কোথায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে এ নিয়ে চিন্তার শেষ নেই বাবুর জন্মদাতা মা-বাবার। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার কী যে অসীম রহমত! তিনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন। আর তাই

তো তার অসীম কৃপায় সমাজের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাবু চান্স পেয়ে গেলো ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে।

রহস্যময় ঘড়িটার দুর্বার গতিতে অক্সফোর্ড থেকে কৃতিত্বের সাথে আইন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লি অর্জন হয়ে গেলো বাবুর। শুধু তাই নয় এরপরও ঘড়িটার দ্রুত গতি যেন আর থামছে না কিছুতেই। আহা, কৌ মহাবিশ্বায়! ইংল্যান্ডের লিংকনস ইন-এ বার এট ল-তে পড়তে ভর্তি হয়ে গেলো বাবু। চোখের পাতা উল্টাতে না উল্টাতেই আরো অবাক বিশ্বে অভিভূত হয়ে যাচ্ছেন সায়েন্টিফিক অফিসার নীলুফার চৌধুরী ও প্রফেসর এ.আর. রাহমান। বিশ্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণাচ্য এক অনুষ্ঠানে ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার ও জাতিসংঘের মহাসচিবসহ অসংখ্য প্রখ্যাত ও স্বনামধন্য ব্যক্তিগৰ্গের উপস্থিতিতে বাবু ও তার কৃতী বন্ধু-বান্ধবদেরকে ব্যারিস্টারি সার্টিফিকেট ও গোল্ড মেডেল পরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এবার আর নিজেকে সামলে নিতে পারছে না প্রফেসর এ.আর. রাহমান। অঙ্গীন আবেগ, বিশ্বায় ও আনন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকল্পিত করে বুকফাটা কান্না ও আর্টনাদে ভেঙে পড়েন তিনি। আজ নীলু-রাহমান দম্পত্তির জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ আজ যেন তারা দুঁজন। এই বিশেষ দিনটির জন্যই তিল তিল করে দিন শুনে এসেছে তারা। এই দিনটির স্বপ্নেই দীর্ঘকাল এক মনে এক ধ্যানে বিভের ছিলেন তারা। শত বছরের অসংখ্য অগণিত সঞ্চিত আবেগে প্রফেসর এ.আর. রাহমান বুকে জড়িয়ে নেন প্রিয়তমা জীবনসাথী নীলুফার চৌধুরীকে। প্রিয়তমা স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত রোমান্টিক কবিদের কবিতা উচ্চস্থরে আবৃত্তি করতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রফেসর এ.আর. রাহমানের। কিন্তু কঢ়টা কেন যেন শুন্দি হয়ে আসছে। বোবা হয়ে আসছে ভাষা। ভাষারা যেন হারিয়ে গেছে ভাষারীন শুক্ষ সমুদ্রের অঠৈ শ্রেতে। আজ তার প্রাণখুলে লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে নজরশুল, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, শেক্সপিয়র, ইয়েটস, কৌটস, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বার্নার্ড শ, বাইরনসহ পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত কবিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কাব্যগাথা। আজ বিশ্বশ্রেষ্ঠ সুরকারদের হারিয়ে অতুলনীয় অসাধারণ সুরকার হতে ইচ্ছে জাগছে তার।

নীলু, চেয়ে দ্যাখো নীলু। আমাদের জীবনে আজ মহা আনন্দের দিন, মহা উৎসবের দিন। দ্যাখো, আমাদের সেই ছোট বাবুটি আজ কত্তো বড় হয়েছে। বাবু আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের বাবু আজ বিশ্বখ্যাত ব্যারিস্টার হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, বাবুর আবৰ্বা! আজ সত্যিই আমাদের মহা আনন্দের, মহা উৎসবের দিন। এর চেয়ে আনন্দ-উৎসবের দিন আর মানুষের জীবনে থাকতে পারে না। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো আনন্দঅঙ্গ উপচে পড়তে থাকে নীলুফার চৌধুরীর দুঁচোখ বেয়ে। মুহূর্তমধ্যে পাল্টে যায় দৃশ্যপট। বাবুর মা-বাবা দুঁজনেই প্রাণভরে দেখছে সে দৃশ্য। সেই ছোটকালের সেই শৈশব-কৈশোরের দুরন্ত-অশান্ত-চপঞ্জলি বাবুটি আর সেই বাবু নেই। বাবু আজ কতো ধীর ছির, কতো প্রশংসন। ইউনিফরম পরা বাবু ধীর পায়ে বিজ্ঞিতে এগিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত হিস্থি বিমান বন্দরের দিকে। অনেকে জ্ঞানীগুণী পরিবেষ্টিত সে। যদিও প্রিয় মা-বাবার চোখে বাবু এখনো বাবুই রয়ে গেছে। কিন্তু লোকজন এখন আর তাকে বাবু বলে ডাকছে না। বিমানবন্দরে অগনিত জনসাধারণ গভীর আঘাতে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। আর অদূর বা দূর থেকে সবাই তাকে ‘ব্যারিস্টার নোভা রাহমান’ বলে শ্রদ্ধাভরে সমোধন করছে।

বাবুর মা, দ্যাখো, দ্যাখো, এতো বাবু বিমানে চড়ছে। আজই সে আমাদের বাংলাদেশে চলে আসবে। হ্যাঁ, বাবুর আবৰ্বা। এতো হিস্থি বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এ রওনা দিচ্ছে বাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বুকের রত্নটা আমাদের বুকেই ফিরে আসবে। বাবুর মা, দ্যাখো এইতো শো শো শব্দে বিমানটা আমাদের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে ল্যান্ড করছে। এইতো সব যাত্রীদের ভিড় অতিক্রম করে আমাদের বাবুটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অকল্পনীয় অসীম আবেগ উল্লাসে পুলকিত অভিভূত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে নেন নীলু-রাহমান দম্পত্তি।

বাবুর মা, দ্যাখো বাবুর মা, দ্যাখো। শতো-সহস্র লাঞ্ছিত-বাঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িত জনতা কেমন ভক্তি ভালোবাসা মিশিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের বাবুকে। কেমন পুনৰ্বৃষ্টি বর্ষণ করছে ওরা। অস্ফুট কঠে প্রকাশ করেন প্রফেসর রাহমান। হ্যাঁ, বাবুর আবৰ্বা, ন্যায় অধিকার বাঞ্চিত, দুর্বল অসহায় মানুষগুলো এবার নিশ্চয় তাদের অধিকার ফিরে পাবে। আমরা যে স্বপ্ন সফল করতে পারিনি, আমাদের বাবুটাই সে স্বপ্ন সফল করবে— ইন্শাআল্লাহ। হ্যাঁ, বাবু আসছে, সত্যিই এগিয়ে আসছে গভীর আবেগ-আপুত আবেগ উচ্চস্থিত বাবু।

বিশ্বকর ও গৌরবময় পরম প্রাপ্তি অর্জন করে স্বর্গীয় আনন্দ অঙ্গের বন্যায় ভাসিয়ে জীবনের সবচেয়ে আপনজনদের বুকে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে সে। সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে অপেক্ষারত প্রাণপ্রিয় মা-বাবা দুঁদিক থেকে দুঁহাত বাড়িয়ে পরম আবেগে ও গভীর ভালোবাসায় বুকে জড়িয়ে নিচ্ছে তাকে। জান্নাতের এক ঝলক সুশীতল ও সুমধুর দমকা হাওয়া যেন আছড়ে পড়ছে বিমান বন্দরের প্লাটফর্মে। সহস্রা মোবাইলে রিংটেন বেজে উঠলো! কোথেকে যেন একটি ফোন এলো। ফোনটা রিসিভ করতেই দূর থেকে ভেসে এলো প্রফেসর রাহমান সাহেবের অতি প্রিয় সহকর্মী ড. আরমান আজমের কঠস্থর ‘হ্যালো, বিপ্লবী স্যার, কেমন আছেন? কলেজ-ম্যাগাজিনে একটি ছোটোগল্প দিতে চেয়েছিলেন। লেখাটা কি খবর?’ ‘অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় স্যার, গভীর ঘুমের মাঝেই গল্পটার পুট তৈরি হয়ে গেছে। এখন শুধু কম্পিউটার কম্পোজ করার অপেক্ষা মাত্র।’

বাবুটা তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে তার প্রিয় মা-বাবা নীলু-রাহমানের বুকের মাঝে!

লেখক : প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ



প্রণয়

ফাহিমা আক্বার

দরজার লক খুলে কাঁধের ব্যাগটা ডাইনিং টেবিলে রাখলো পুস্তিতা। অভ্যাসমতো মুঠোফোনের দিকে তাকালো, একটি কল অথবা মেসেজ নেই রাফির নম্বর থেকে। রাফির প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা কখনো অভিমানী হতে দেয়নি পুস্তিতাকে। গ্লাসে ঢালতে ঢালতে ব্যালকনিতে ঝুলানো অর্কিডের দিকে তাকালো সে। বেগুনি ফুল আর গাঢ় সবুজ পাতা মিলে চমৎকার লাগছে। পুস্তিতা-রাফির সংসারের প্রথম কেনা জিনিস ওটা। রাফির সঙ্গে প্রথম দেখাটা মনে পড়ে হেসে ফেললো সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনের ক্লাস শেষ করে সে উৎফুল মন নিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরেই গান্ধীর মুখে একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো, আড়চোখে দেখে নিলো সে, ছেলেটাকে কী ক্লাসে দেখেছে? হবে হয়তো, নাকি সিনিয়র কেউ। আর ভাবতে চাইলো না। বাসায় ফিরে বাবার সাথে কী কী গল্প করবে তার লিস্ট তৈরিতে মনোযোগী হলো সে। হ্যাঁ ভাইয়া, গোলাপ নেন, বেশি না ১০ টাকা; আপারে দিবেন। পুস্তিতা তাকালো, ছেলেটির চোখে চোখ পড়তেই সে আমতা আমতা করে বললো, না না লাগবে না, যাও। ছেলেটির ভ্যাবাচ্যাকা চেহারা দেখে হেসে ফেললো সে। ফুল কিনবে না এটা বলতে এতো ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার কী আছে? এ গল্পটা বাবাকে আরো কত মশলা দিয়ে বলবে সেটা ভাবতেই ওর ঘরে ফেরার তাড়া বেড়ে গেলো।

তারপর সেই গান্ধীর সহপাঠীর সাথে একসময় বন্ধুত্ব তৈরি হলো, এরপর সংসার। বাবার পর যে মানুষটা বন্ধু সে হলো রাফি। এখনো দুজনের সাথে সারাদিনের গল্প না করলে ওর ভালো ঘুম হয় না।

সারাদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে ছোট ছোট কয়েন বলে মনে হয়। ছোট বেলায় স্কুল থেকে ফিরেই মাটির ব্যাংকে জমা করে রাখতো কয়েন আর বন্ধুর পয়সার শব্দে মনটা দুলে উঠতো। বাবা আর রাফি ওর জীবনের মাটির ব্যাংক, যেখানে পয়সার মতো স্মৃতি জমা করে সে।

বিকেলেই তৈরি হয়ে নিলো সে, হাতে একগুচ্ছ গোলাপ আর সারাদিনের ছোট ছোট গল্প। এইতো চলে এসেছে। বাবা আর রাফি পাশাপাশি ওর জন্য অপেক্ষায় ফুলগুলো রাফির মাথায় কাছে রাখল সে। তারপর বলতে শুরু করলো— জানো বাবা, এরকম লাল গোলাপ দেখেই রাফি সেদিন আমতা আমতা করেছিলো, বলে হেসে উঠলো সে, আর অনুভব করলো রাফির মুখে মুচকি হাসি, আর বাবা যেভাবে অট্টহাসি দিয়ে বলতো— তাই না কিরে হাঃ হাঃ, সেভাবেই বলছে। আরো কতো গল্প, সারাদিনের সকল কথা বলতে বলতে মনটা ভারী হয়ে উঠল তার। দুটো বছর পৃথিবী ছবির থেকে এখন আবার সচল হয়েছে, বাবা। করোনাকে এখন আর কেউ ভয় করে না। শুধু আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে।

আর তুমি আর রাফি কত দ্বার্থপর দেখো, দুজনে আমাকে আড়ালে রেখে পাশাপাশি ঘর বানিয়ে ঘাসের ছাদের নিচে দিবিয় আছ আর আমাকে স্মৃতি পাহারা দিতে রেখে গেছো। একেবারেই ঠিক না— চোখ জলে ভরে উঠলো।

স্মৃতি কারো কাছে চোখের পাতার এতো কাছে থাকে যে, চুকে যায় দুই জগতের দূরত্ব। কখনো মনে হয় না, তোমরা এক জগত সমান দূরত্বে আছো। এখনো মুঠোফোনে তোমাদের কল বা মেসেজ এলো কিনা দেখে নিই। রোজ রোজ এতো কথা হয় তোমাদের সাথে যে, ভুলেই যাই আমার কথাই শুধু আমি বলবো কিন্তু তোমাদের জবাবগুলো আটকে থাকবে অন্য জগতের ইথারে, আমার কাছে পৌছাবে না।

লেখক : প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

স্মৃতি কারো কারো কাছে চোখের
পাতার এতো কাছে থাকে যে, চুকে
যায় দুই জগতের দূরত্ব।



অভিযান শিপন আলম

দিবসের সবচেয়ে রোদ্র কোথায় যেন দ্রুতই মিলিয়ে গিয়ে পশ্চিমাকাশের পাহাড়সদৃশ এলোমেলো মেঘগুলো সিথির সিঁড়ুরের ন্যায় লালচে বর্ণ ধারণ করলো। শরতের বিকেল আর কচুপাতায় পতিত পানির ছায়িত্ব যেন একই। দুটোই মানব হৃদয়ে সৌন্দর্যের ছটা ছিটিয়ে, মনকে আন্দোলিত করে খুব দ্রুত হারিয়ে যায়।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝি তার নৌকার ইঞ্জিন স্টার্ট দিবে। ধীরে ধীরে সবাই নৌকার দিকে আসতে শুরু করলো। মাঝিও সবাইকে নৌকায় এসে বসার জন্য হাঁক-ডাক ছাড়তে লাগলো। মাঝির হাঁক-ডাক আর নৌকায় আগত যাত্রীদের উপস্থিতি যতই বাড়তে লাগলো সিয়ামের মনে অঙ্গুষ্ঠার পারদ ততই বেড়ে চললো। ছেলে দুটো আর মেয়েটিকে নিয়ে কিশোর বয়সী ছেলেগুলো তখন অনেক দূরে মিলিয়ে গিয়েছে। তাদের আর কোন নিশানা চোখে পড়ছে না। উঠতি বয়সের তরুণ সবাই। আবেগ আর উন্নাদনার বশবর্তী হয়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে তাহলে এই দশ-বারোটি ছেলে-মেয়ের জীবনেই ঘোর অমানিশার নিকষ অন্ধকার নেমে আসবে। সাথে হারিয়ে যাবে তাদরকে ঘিরে পরিবারের স্বপ্নগুলোও। শুনেছি ঢাকার বিভিন্ন ছানে এরকম উঠতি বয়সের তরুণেরা বিভিন্ন গ্যাং তৈরি করে ভয়ঙ্কর সব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তার প্রভাব যদি এখন গ্রাম পর্যায়ে এসেও পড়ে তাহলে তো এ জাতির ভবিষ্যৎ বড়ই বেদনাদায়ক।

সিয়াম এসব ভাবতেই নৌকা ছাড়ার উপক্রম হলো। সাথে আসা সহকর্মী নাজির ভাইকে সে বিচলিত কঠে জিজেস করলো—
— এখন কি করা যায় নাজির ভাই?

নাজির ভাই বয়সে সিয়ামের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হলেও তারা একই সাথে চাকরিতে যোগদান করেছে। দুজনেই একটি প্রতিষ্ঠানের নবীন কর্মকর্তা। চাকরি ও চাকরির বাইরের বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ দুজনের এই বয়সের ব্যবধানকে কমিয়ে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত করেছে। আজকের মতো বিকেল হলেই একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘূরতে বের হওয়া তাদের নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ঘূরাঘূরি শেষে আরও অনেকের সাথে চায়ের স্টিলে বসে চা খাওয়া, মিষ্টির দোকানে বসে আয়েস করে টক দই খাওয়া, রাজনীতি-আরাজনীতি, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ করা তাদের নিত্য কর্মের মধ্যেই পড়ে। নাজির ভাই বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী তবে কম উদ্যোগী; তিনি সাহসী তবে বুঁকি এড়িয়ে চলেন; আত্মসচেতন তবে আত্মকেন্দ্রিক নন; পরদুঃখকাতর তবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নয়। অপরদিকে সিয়ামের স্বভাব পুরোপুরি বিপরীত। সে উদ্যোগী, কৌতুহলী, পরদুঃখকাতর এবং একই সাথে বুঁকিপ্রিয়। তবে দুজনের মধ্যে একটি সাধারণ গুণ আছে— কেউই স্বার্থপ্রের নয়। একজন কোন ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে অন্যজন ভাল না লাগলেও তাতে সায় দেয়। তাই সিয়াম যখন বিচলিতভাবে জিজেস করলো কি করা যায় তখন নাজির ভাইও তাতে সায় দিয়ে বললেন—

— কিছু একটা করা দরকার।

কিন্তু কি করা যায় সে ব্যাপারে কিছু বললেন না।

নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভেবে আর কোন কথা না বাড়িয়ে নৌকা থেকে নামতে যাবে এমন সময় সিয়াম দেখতে পেলো তাদের থেকে বেশ দূরে চরটি যেখানে নিচ হতে হতে আবার উঁচু হয়েছে তার চূড়ায় দু-তিনজন তরুণ তাদের দিকে হাত ইশারা করেছে। হাত ইশারার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে কষ্ট হলো না সিয়ামের। নৌকা ছাড়ার উপক্রম হওয়ায় হাত ইশারা করে তারা না আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে বলছে।

— একটু পরে রওনা দেন, এ যে কয়টা ছেলে আসছে।

সিয়াম মাঝিকে বললো। কিন্তু যাত্রীদের হটেগোল, ইঞ্জিনের শব্দ আর খোলা নদীতে বাতাসের শনশন শব্দে মাঝি তার দিকে তাকালেন

বটে তবে কিছুই শুনতে পেলেন না। তখন হাত দিয়ে চরের মধ্যে হঠাত আগত ছেলেদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। মাঝিকে ইশারায় দেখাতে গিয়ে সে খেয়াল করলো আরও কয়েকজন ছেলে নিচু খাল পেরিয়ে উপরে উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে তাদের সংখ্যাটা সাত জনে গিয়ে দাঁড়ালো। নৌকার নিকটবর্তী হতেই সিয়াম তাদের জিজ্ঞাসা করলো-

- তোমরা কি কয়েকজন ছেলে আর একটা যেয়েকে তোমাদের দিকটা দিয়ে যেতে দেখেছ?

- হ্যাঁ, যেতে দেখেছি, তবে ওরা আমাদের থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে চরের ভেতরের দিক চলে গেছে।

ওদের কথার আওয়াজ শুনে মনে হলো কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে।

আগত ছেলেদের মধ্যে মোটা ফ্রেমের চশমা পরা একটি ছেলে উভর দিলো। সিয়াম খেয়াল করে দেখলো ওরা সংখ্যায় মোট সাত জন। ওদের মধ্যে চশমা পরা এই ছেলেটি বাদে বাকি কারো চোখে চশমা নেই। তবে কয়েকজনের চোখে সানগ্লাস ছিলো। ওদেরকে দেখে খুবই উদ্যমী ও সাহসী মনে হলো। নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পর সিয়াম জানতে পারলো ওরা জেলার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র।

-আমি যদি বলি আমরা যেয়েসহ ছেলে দুটোকে খুঁজতে যাব তোমরা কি যাবে আমাদের সাথে? সিয়াম ঠোঁটের কোণে খানিকটা সংকোচ নিয়ে তাদের মনোভাব জান্য জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু সীমাহীন উদ্যম আর সাহসিকতায় ভরা এই সাতজন তরুণই তাকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে সমস্তের বলে উঠল-

- হ্যাঁ, অবশ্যই।

- তাহলে নেমে পড়ুন, নাজির ভাই।

তবে সিয়াম বিস্ময়াভিত্তি হয়ে লক্ষ্য করেলো নৌকার আর কোন যাত্রী এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখালো না। সিয়াম মাঝি ও যাত্রীদের বললো আপনারা ঘাটে গিয়ে আমাদের সমস্যার কথা জানিয়ে আরেকটি নৌকা পাঠাতে বলবেন। মাঝি ‘জি’ বলে ইঞ্জিনের প্যাডেল সজোরে বার করেকে ঘুরাতেই মেশিনের চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া উদগীরণ করে সন্ধ্যার নির্জনতাকে ভঙ্গ করে নৌকা সবেগে ঘাটের দিকে ধাবিত হলো।

সন্ধ্যা গড়িয়ে ধীরে ধীরে নির্জন চরের বুকে রাত নেমে এলো। বাতাসের একটানা শনশন আওয়াজ, চারিদিকে বিঁবিঁ পোকাসহ নানা রকম পোকার বিঁবিঁ, কটর মটর, চি চি শব্দ আর দূরের বন থেকে ভেসে আসা খেক-শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক চরের এই নির্জনতাকে এক ভয়ানক রূপ দান করলো। তবে ভাগ্য সুস্থসন্ন যে বসন্তের সেই সুন্সান রাতে সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের বুকে ঝুলে থাকা আধখানা চাঁদের মায়াবী আলো চরের সাদা বালির উপর পতিত হয়ে রাতের অন্ধকারকে অনেকটাই স্নান করে দিয়েছিল। উপরন্তু সবার হাতেই ছিল মোবাইলের টর্চলাইট।

- আমরা যেহেতু একটি বুঁকিপূর্ণ কাজে যাচ্ছি আমাদের অবশ্যই কিছু পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। সিয়াম চৌদ্দটি উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

- আর পরিকল্পনাটি অবশ্যই নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। বড় কোন বুঁকিতে পড়া যাবে না। নাজির ভাই যোগ কারলেন।

- ঠিক তাই। সবাইকে একসঙ্গে তাকাতে হবে। কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। মোবাইলের টর্চলাইট অফ করে চুপি চুপি এগোতে হবে যাতে ওরা আমাদের দূর থেকে দেখতে না পায়। আর ওদের কাছাকাছি যেতেই সবাই একসাথে ‘ধর’ বলে জোরে জোরে চিৎকার করতে হবে যাতে ওরা আমাদের সংখ্যাটিকে অনেক বেশি মনে করে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়।

নিষ্ঠুর রাতের আধো আঁধারকে দূরে ঠেলে মাথার ওপর ঝুলে থাকা আধখানা চাঁদের জোছনায় সিয়ামের নির্দেশনামতো সবাই একসাথে পথচলা শুরু করলো। কেডস, সু আর চটি স্যান্ডেল পরিহিত আঠারোখানা পা-কে শুকনো মাটি আর বালি যেন পরম আতিথে জায়গা করে দিচ্ছিলো। নরম বালিতে অল্প গেড়ে যাওয়া পায়ের সম্মুখ অংশের আঘাতে বালিরাশি অল্প দূরে গিয়ে নিষ্কিণ্ড হচ্ছিলো। উঁচু নিচু পথ মাড়িয়ে তারা সম্মুখে ধাবিত হতে লাগলো। সদ্য শুকনো ছোট ছোট খালের কিনারা দিয়ে যখন তারা যাচ্ছিলো বালির উপর থাকা চাকার মতো দেখতে শুকনো খড়খড়ে মাটি কড়মড় করে ভেঙে আশ্র্য এক সংগীত দ্যোতনা সৃষ্টি করছিলো। নদীর সাথে মিতালি করে বেড়ে ওঠা সিয়ামের নিকট এ শব্দ খুবই পরিচিত। একটি খালের উপর দিয়ে অতিক্রমকালে খালের পাড়ে বেড়ে ওঠা একটি বোঁপ থেকে হঠাতই ফুরুৎ করে একটি ছোট পাখি শব্দ করতে করতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উড়ে পালালো। বোধ হয় বাটুই পাখি হবে। ছাত্রদের মধ্যে দুই একজন মনে হলো কিপিংৎ ভয় পেলো। সিয়ামের মনে পড়ে গেল ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছে এসব পাখির বাসা আর ডিম খুঁজে খুঁজে।

নিঃশব্দে উঁচু নিচু ঢালু পথ পাড়ি দিতে দিতে তারা প্রায় বড় খালটির নিকট চলে এলো। কেউ একজন বললো দূরে খালের পাড়ে মানুষের মতো কয়েকটা ছায়াসদৃশ কিছু দেখা যাচ্ছে। সিয়াম একটু উঁচু জায়গায় উঠে টি-শার্টের উপর দিয়ে বুকের ওপর ঝুলে থাকা পাওয়ারওয়ালা শক্ত ফ্রেমের চশমাটি চোখে দিয়ে আবছা অন্ধকারকে ভেদ করে ছায়ামূর্তিগুলো দেখার চেষ্টা করলো। নতুন চাঁদের

নতুন জোছনায় সিয়াম গুণে গুণে একে একে চারটি ছায়ামূর্তি আবিষ্কার করলো। কিশোর ছেলেগুলোকে ভড়কে দেওয়ার এখনই সময় যাতে ওরা আমাদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন ধারণা করতে না পারে। ভাবা মাত্রই সিয়ামের মুখ থেকে বিকট জোরে ‘ধর শব্দটি বেরিয়ে আসতেই বাকি আটজনও একযোগে ‘ধর’ বলে প্রচও এক বজ্রনিনাদের সৃষ্টি করে বালির স্তুপ অতিক্রম করে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সামনের দিকে ধাবিত হলো। হঠাতই সিয়ামের মাথায় আরেকটি বুদ্ধি খেলে গেল। রাতের পরিবেশ এমন যে প্রকৃত অবস্থা বোধগম্য হয় না। যুগে যুগে অনেক দুর্বল প্রতিপক্ষ অন্ধকারের এই নির্জনতাকে কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে প্রকৃত অবস্থা বুবাতে না দিয়ে অভিযান পরিচালনা করে জয়লাভ করেছে। ইউটিউব এর ভিডিওতে, গুগল এর পেজে আর বইয়ের পৃষ্ঠায় এসব বিপজ্জনক অভিযানের দুর্ধর্ষ কাহিনি স্যাত্মে লেখা আছে। একজন অনুসন্ধিৎসু মানুষ হিসেবে সিয়ামের এসব অভিযানের কথা অজানা নয়। সে ভাবলো আরেকটি কৌশল নিলে কেমন হয়। আমরা কারা তা তো আর ঐ ছেলেগুলো জানে না। আমাদের সাথে কী অন্তর আছে তাও তারা জানে না। আমরা সংখ্যায় কতজন সেটিও তাদের জানার কথা নয়।

এখন আমরা যদি গুলির কথা বলি তাহলে তা তাদের জন্য ভয়ের কারণ হবে। ভাবামাত্রই সে চিংকার করে বলে উঠলো।

- এই...গুলি করার দরকার নেই। ছেড়ে দে, গুলি করার দরকার নেই।

কথাটি সে দ্রুত বলতে বলতে সামনের দিকে ছুটে চললো। পাশে থাকা নাজির ভাই তো এই কথায় একটু হো হো করে হেসেই ফেললেন। এটি যে একটি কৌশল তা তিনিও বুবাতে পারলেন। সিয়াম আর নাজির ভাই পাশাপাশি দৌড়াচ্ছিল। সামনে আর আশেপাশে ছিল ছেলেরা। তাদের কয়েকজন দ্রুত দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছিল। বড় খালটার পাড়ে বালি অনেকটা শক্ত হয়েছিল। পাড় থেকে ঢালু জায়গায় যেতেই সিয়ামের কানে এলো।

- ভাই, আমাদের ছেলে-মেয়েদের পাওয়া গেছে। দৌড়ে গিয়ে সিয়াম দেখলো একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে তাদের ছেলেরা ঘিরে রেখেছে।

- আমি তো বিকেলে তিনজনকে দেখেছি, আরেকটি ছেলে কোথায়?

জোরে শ্বাস নিতে নিতে সিয়াম জিজ্ঞেস করলো। উদ্বারকৃত ছেলে আর মেয়েটি ভয় আর আতঙ্কে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। তারা অনেক চেষ্টা করেও গোঙানি ছাড়া কোন কথা বলতে পারলো না। কিছুক্ষণ বাদে আরেকটি ছেলে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে এসে বললো

- আপনাদের শব্দে ওরা ভয় পেয়ে আমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। আমি জোড়াজুড়ি করাতে ওরা আমাকে চড়, থাপড়, লাথি মেরেছে কিন্তু আপনারা অতি দ্রুত চলে আসায় কিছুদূর নেওয়ার পরে আমাকে রেখেই দৌড়ে পালিয়েছে।

আবছা চাঁদের আলোয় খালের ওই পাড়ে পাবনা যাওয়ার পথটির দিকে তাকিয়ে সিয়াম দেখতে পেলো কিছু ছেলে শিকার হারানো শিকারীর ন্যায় ব্যর্থ মনোরথে তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে আর অস্ফুট স্বরে কিছু বলার চেষ্টা করছে। সিয়ামরা সবাই মিলে ছেলে দুটি আর মেয়েটিকে অনেক অভয় বাণী দিতে লাগলো। সিয়াম বললো

- ভয় নেই, আমরা তোমাদের উদ্বার করতেই এসেছিলাম।

একজনের কাছে থাকা পানি আর ড্রিংকস এর বোতল দিলো তাদের। পানি পান করে তারা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো। এই ফাঁকে সিয়াম চারপাশটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নিলো। জায়গাটা নিচু এবং ঢালু। কাছে না এলে দূর থেকে কিছুই বুবার উপায় নেই। এটি বড় খালের পাড়ের অংশ। তবে কিছু দূরে পশ্চিম পাশে আরো একটি ছোট শুকনা খাল আছে। তার পাড়ে দূর থেকে উড়ে আসা জ্যাটবন্দ বালি চাঁদের আলোয় চিকচিক করছিলো। বড় খালটিও প্রায় শুকনো হতে চলেছে। ভিতরের গভীর অংশ বাদে পাড়ঘেঁষা দক্ষিণের অংশটির বেলে-কাদা মাটিতে কৃষকেরা ধানের চারা রোপণ করেছে। চারাগুলো কিছুদিন আগেই রোপণ করা হয়েছে বলে মনে হলো। কৃষকদের পায়ের ছাপ এখনো দৃশ্যমান আর চারাগুলোও অনেক ছোট।

ছেলে-মেয়ে তিনটি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় সিয়াম তাদের জিজ্ঞেস করলো

- তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করেছে নাকি?

- আমার মোবাইল কেড়ে নিয়েছে আর মোবাইল দিতে না চাওয়ায় একটি চড় মেরেছে।

সুঠাম শরীর আর লম্বা চুলের অধিকারী ছেলেটি জানালো।

- আর আমার ঘটনা তো বললামই। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। আপনারা দ্রুত এসে পড়ায় রক্ষা পেয়েছি। আমার ঠোঁটের বাম পাশে উপরের দিকে চড়ের আঘাতে কিছুটা কেটে গিয়েছে।

হালকা পাতলা গড়নের লম্বা ছেলেটি বললো।

সিয়াম মোবাইলের টর্চলাইটের আলোয় দেখতে পেলো সত্যিই সেখানে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গিয়েছে। মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বে সিয়াম সবার উদ্দেশ্যে বললো

- আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই বাকি কথা যেতে যেতে শুনা যাবে। আধো চাঁদের আধো আলোয় আর মোবাইলের টর্চলাইটে পাথার বুকে জেগে ওঠা চরে উঁচু নিচু বালির স্তুপ মাড়িয়ে ঘাটের দিকে তারা রওনা দিলো। অন্নবয়সী ছেলে-মেয়েগুলোকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর অপরিমেয় তৃষ্ণির চিহ্ন এখন সিয়ামের চোখে মুখে। ছেলে দুটোর যাইহোক, মেয়েটির যে সর্বনাশ হয়ে যেতো তা প্রায় নিশ্চিতই ছিলো। সব কিছু কি আশ্চর্যজনকভাবে ঘটে গেলো। পুরো বিষয়টি সিয়ামের কাছে ইউরেকা ইউরেকা মতো হতে লাগলো। মেয়েটি সিয়ামের পাশেই হাঁটছিলো।

সিয়াম তাকে জিজেস করলো

- তোমার কোন ক্ষতি করেনি তো ছেলেগুলো।

- না ক্ষতি করেনি, হয়তো করতো।

- কিছু জিজেস করেছে?

- হ্যাঁ, করেছে। বলেছে ছেলে দুইটার সাথে তোর কী সম্পর্ক? নদীতে কেন আসছিস ইত্যাদি। মাথার উপর থেকে কান আর ঘাড়ের উপর দিয়ে নেমে আসা সাদা আর লাল রঙের ওড়নার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ফরসা লাজুক আর ভীত গালটি সিয়ামের নিকট চাঁদের আলোতে বড়ই সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হচ্ছিলো। এতক্ষণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে সে কিছুই ঠিকমত খেয়াল করতে পারেনি। এখন যেহেতু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে তাই আকাশ থেকে ঠিকরে পড়া চাঁদের আলোয় ছেলেমেয়ে তিনটির গায়ের পোশাক, পায়ের শব্দ সব কিছুই সে নিবিড়ভাবে খেয়াল করতে পারছে। সব কিছুই তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হতে লাগলো। মনে হলো বিধাতা যেন তাদের দ্বারা অস্তর একটি কাজকে সম্ভব করেছেন। এরকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে তার মধ্যে সাহস ও শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তাকে জগদ্বিখ্যাত সেনাপতিদের মতোই রাতের অন্ধকারে ঢাল তলোয়ার আর অন্ধক্ষেত্র ছাড়াই একটি সফল অভিযান পরিচালনার সীমাহীন তেজ, প্রজ্ঞা, মেধা দান করেছেন। নিজে একনিষ্ঠভাবে স্রষ্টার পূজারী না হলেও স্রষ্টার প্রতি তার বিশ্বাসের কমতি নেই। বিপদে আপন্দে তার নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করে সে। এ বিশ্বাস থেকেই স্রষ্টার প্রতি শত সহস্রবার স্তুতি প্রকাশ করতে লাগলো সে।

এমন একটি রোমাঞ্চকার ঘটনা সিয়ামের জীবনে ঘটবে তা ছিল তার নিকট রীতিমতো অভাবনীয় ব্যাপার। অথচ তাই এখন ধ্রুবতারার ন্যায় সত্য হয়ে ধরা দিলো। তার মনে হলো এই তো কিছু সময় আগে বসন্তের মৃদু প্রবাহিত বাতাস থেতে থেতে, আকাশে হালকা সাদা মেঘের অপরূপ সৌন্দর্যে চোখ বুলাতে বুলাতে, ঘাটে বাঁধা ডিঙি নৌকায় চেপে, স্বচ্ছ নির্মল পানিতে হাত-পা ভিজাতে পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চরে ঘূরতে এসেছিল সে এবং নাজির ভাই। চরে এসে সন্ধা দ্রুত ঘনিয়ে আসায় এই সুন্দর বিকেলের কিছু মুহূর্ত মোবাইলের ক্যামেরায় ধারণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। সংক্ষ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে পশ্চিমাকাশ যখন লালচে বর্ণ ধারণ করছিলো, চরের বুকে খাবার খুঁজতে থাকা পাখিরা যখন ডানা মেলে কিচিরমিচির কিচিরমিচির করতে করতে নীড়ে ফিরে যাচ্ছিলো, বেড়াতে আসা সব বয়সী মানুষেরা যখন চরে ভেড়ানো নৌকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো ঠিক তখনই সিয়াম হঠাতে লক্ষ্য করলো সবাই ফিরে চললেও ৭-৮ জন উঠতি বয়সী ছেলে একটি কিশোরী মেয়েকে নিয়ে জোরে শব্দ করতে করতে চরের ভেতরের দিকে যাচ্ছে। বিপরীতমুখী এ দৃশ্য তাদের দুজনকে বেশ অবাক করলো। তাদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে লাঠি ছিলো এবং তাদের কথাবার্তা ও আচরণ ছিলো আক্রমণাত্মক। কিছুক্ষণ দূর থেকে পর্যবেক্ষণের পরে সিয়ামের নিকট মনে হলো তারা দুভাগে বিভক্ত। মেয়েটি এবং পাশে থাকা দুটি ছেলের ওপর চড়াও হয়েছে বাকি ছেলেগুলো। তাদের হাতেই ছিলো লাঠি।

কিশোর ছেলেমেয়েগুলোর এমন আচরণ দেখে সিয়ামের শক্তি হলো হয়তো খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। তাই দুজনে একটু কাছে গিয়ে দূর থেকে জিজেস করলো কী হয়েছে তাদের মধ্যে। আকস্মিক এ জিজ্ঞাসায় তারা একটু অবাক হলো। তাদের মধ্যে ফর্সা চেহারার প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার নেতা গোছের এক কিশোর বললো

- ভাই, কোন সমস্যা নেই। এমনিই কথা বলতেছি।

- মনে তো হচ্ছে তোমাদের মধ্যে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে।

- ভাই, বললাম তো কিছু হয় নাই।

- যাইহোক, চরের মধ্যে ঝামেলা করো না।

সিয়াম আশা করেছিলো, যে তিন জনের উপর বাকিরা চড়াও হয়েছে তারা এ ব্যাপারে তাদের কিছু বলেবে। কিন্তু তাদের দিক থেকে কেউ কোন কথা না বলায় তারা ভেবে নিলো এই কিশোরেরা সবাই একসাথেই এসেছে। তাই তারাও আর কোন উচ্চবাক্য না করে দুজনই নৌকায় উঠার জন্য পা বাড়ালো। কিশোরেরাও ধীরে ধীরে চরের ভেতরে চলে গেলো।

এ পর্যন্ত ভাবা মাত্রই তারা হাঁটতে হাঁটতে চরের মাঝামাঝি চলে এসেছে ঠিক তখনই সহসা ঘাটের দিক থেকে কয়েকজন লোক হাতে কান্তে, দা, লাঠি নিয়ে জোরে ধীরে চিতকার করতে করতে তাদের দিকে আক্রমণাত্মকভাবে তেড়ে এলো। রাতের নির্জনতায় তা ছিলো খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তবে সিয়ামের ছিল ভয়তরহীন। তাদের মধ্যে খুব একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেলো না। কোরণ তারা অনুমান করতে পেরেছিল যেহেতু লোকগুলো তাদের ঘাটের দিক থেকে আসছে তাই তারা তাদেরই লোক হবে। তাছাড়া তারা যাত্রার শুরুতেই

তীরমুখী নৌকার যাত্রীদের বলেছিলো তারা যেন ঘাটে গিয়ে সবাইকে তাদের কথা বলে এবং তাদের নিতে নৌকা পাঠায়। কিন্তু আগন্তক লোকসকল সিয়ামদের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো না। তাই রাত্রির নির্জনতাকে ভেদ করে ক্ষিপ্রগতিতে তেড়ে আসলেও সিয়ামদের দিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় আর তাদের দিকেই আসতে থাকায় তারাও অনেকটা আশ্চর্ষ হলো তাদের টার্গেট সিয়ামরা নয়, অন্য কেউ। আগন্তকদের মধ্যে বড় দা হাতে লুঙ্গি পরা কালো লোকটা পুরো চেহারায় ভয়ানক রাগ চেপে ধরে চিংকার করে বলতে লাগলো।

- এতো বড় সায়োস শালাদের, আজ দশ বচর দরে নৌকা চালাই, কোনদিন কোনো দুর্ঘটনা গটলো না। আর আজ পদ্মাপাড় শালারা আমারে ছাওয়ালপল দরে নিয়ে যায়। এতোবড় সায়োস শালাদের।

- টেনশনের কোন কারণ নাই বড় ভাই। এখন আর কোন সমস্যা নাই। আমরা ছেলেমেয়েগুলো উদ্বার করেছি।

ওরা পালিয়ে গেছে।

সিয়াম মাঝিকে আশ্চর্ষ করলো। কিন্তু মাঝি সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপ না করে হিংস্র পশুর ন্যায় রাগে গদগদ করতে করতে দা উঁচিয়ে সামনের দিকে তেড়ে গেলো। কিছু সময় আপন মনে বকাবকা করে আবার সিয়ামদের নিকট ফিরে এলো।

- বলেন বাই, আজ দশ বচর মাজিগিরি করি কোন সমস্যা অয় নাই। আর আজ ত্রিচ্যাংড়া পোলাপান আমার সর্বনাশ করে ছাড়লো। যদি এই খরব সবাই জানে তালি কি মেয়ে ছাওয়ালপল চরে গুরতে আসবিনি আর। তারা না আসলি আমার ইনকাম কমে যাবি না?

- আপনার সমস্যা বুবাতে পারছি। যেহেতু আমরা ছেলেমেয়েগুলো উদ্বার করেছি। আশা করি কোন সমস্যা হবে না।

চলেন যাই এবার।

নাজির ভাই অনেক সময় পরে মুখ খুললেন। তার আশ্বাসে মাঝি ও তার লোকজন শান্ত হলো। সবাই নৌকার দিকে এগোতে লাগলো।

ইতোমধ্যে বাতাসের গতি বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিঁবিঁ পোকাদের দল পরম নিশ্চিন্তে বিঁ বিঁ ডাকে পুরো চর মাতিয়ে রেখেছে। চাঁদের আলো মলিনভাব বেড়ে অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হালকা ঠান্ডাও শুরু হয়েছে। নির্জন চরে এতোক্ষণ উভেজনায় কিছু বুবাতে না পারলেও ক্রমে তা প্রশংসন হয়ে যেতেই সিয়ামের নিকট অন্যরকম মনে হতে লাগলো।

পাশে থাকা উদ্বারকৃত ছেলেমেয়েদের নিকট জানতে চাইলো।

- আচ্ছা, তোমাদের যখন ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো আমি আর নাজির ভাই গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের মধ্যে কোন ঝামেলা হয়েছে কিনা। তোমরা তখন কোন কথা বলো নাই কেন?

- আসলে ভাই, ওরা আমাদেরকে এমনভাবে খেট করেছিলো যে, আমরা ভয়ে কিছু বলি নাই।

হালকা পাতলা লস্থ পড়নের ছেলেটি জবাব দিলো।

- কী খেট করেছিলো তোমাদের?

- আপনাদের আসা দেখেই ওরা আমাদের বলেছিলো যদি কিছু বলিস তাহলে খবর আছে। তাই ভয়ে কিছু বলিনি। সিয়াম ভাবলো তিনটি কিশোরবয়সী ছেলেমেয়ে। তাদের দ্বারা পরিষ্কৃতি অনুমান করা কঠিন। ভবিষ্যৎ অনুমান করা তো আরও কঠিন। তাই কিঞ্চিৎ ভয়ভিত্তি প্রদর্শনের মুখে তাদের দ্বারা কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। কথা বলতে বলতে তারা এতোক্ষণে চরে ভিড়ানো নৌকার নিকট চলে আসলো। একে একে সবাই নৌকায় উঠে বসে পড়লো। আধাঘন্টার মধ্যে নৌকা চাঁদের আলোয় পথ চলতে চলতে ঘাটে এসে ভিড়ে গেলো। নৌকা থেকে নেমে উচু পথ পাড়ি দিয়ে পদ্মার ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধের উপর এসে পৌঁছাতেই সিয়াম লক্ষ্য করলো দুজন পুলিশসদস্য তাদের অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে গিয়ে হ্যান্ডশেক করে সিয়াম তাদের জানালো সে-ই ওসি সাহেবকে ফোর্স পাঠানোর জন্য কল দিয়েছিলো। কিন্তু চরটি পাবনা জেলার কার্যাদীন হওয়ায় ফোর্স সেখানে অভিযানে যেতে পারবে না বলে তিনি জানান। ঘাট পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম।

উদ্বারকৃত ছেলেমেয়ে তিনটিকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে সিয়াম ও নাজির ভাই সাথে থাকা ছাত্রদের ধন্যবাদ জানিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলো। সিয়ামের একবার মনে হলো থানায় গিয়ে ওসি সাহেবের সাথে দেখা করে ছেলেমেয়ে তিনটির ব্যাপারে চূড়ান্ত খেঁজ খবর নিয়ে আসি। প্রয়োজনে ওদের বাবা মা-কে কল দেই, সাংবাদিক ডেকে পুরো ঘটনা ব্রিফ করি। পরক্ষণে মনে হলো এতো উদার ও দায়িত্বান হয়ে লাভ কি! বাকি কাজ পুলিশই করব না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতেই বড় অক্ষরে একটি শিরোনাম চোখে পড়লো তার-পদ্মার চরে রাতভর পুলিশি অভিযানে অপহত তিন তরুণ-তরুণী উদ্বার।

ঠেঁটের কোণে মৃদু হাসি টেনে অস্ফুটব্রে সিয়াম অক্ষমাং বলে উঠলো- হুম, রাতভর অভিযান!

লেখক : প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



হৈমন্তীর সাথে একদিন

উমর ফারুক

রোদ পালানো বিকেলে, সরকারি সাঁদত কলেজের ঘাটলায় বসে আছে একজন হৈমন্তী। ওয়াজেদ আলী পন্থীর সি.এম হলের ছত্রাকে যেরা দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা চড়ুই রোজ বসে থাকে। ওর নাম দেওয়া হয়েছে অপু। সালায় তিন ঘণ্টা ধরে পত্রিকা পড়ছে। বড় ভাই, কী করেন? দেখো না? হৃষ্ম, দেখছি তো, আর কতক্ষণ চলবে? এই তো একটা ধর্ষণের খবর পড়ছি। দেশটা দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে বুঝলা ফারুক। একদিনে দশটা ধর্ষণ চিন্তা করা যায়? এই কুতুর বাচ্চাদের ধরে ধরে কাবাব বানায় খাইতে পারলে কেমন হতো বলো তো? কুতুর বাচ্চা খাওয়া যায় ভাই? আপনি কখনো খাইসেন? ধূর মিয়া, কথাটায় জোশ রাখলা না! এই ছোট ভাইদের একটা সমস্যা বেশি কথা কয়। এই কারণে এদের মাঝে মাঝে থাপ্রাইবেন ভাই? আচ্ছা একটা থাপ্পর মাইরা চলে যান ভাই, আর কতক্ষণ দাঁড়াই থাকবো? এ মেয়েটা কে রে ফারুক? কোন মেয়েটা, ভাইয়া? এ যে ঘাটলায় বসে আছে, ওহ ওর নাম? ওর মান হৈমন্তী! বলিস কি, নামটা সুন্দর তো! মেয়েটাও অনেক সুন্দর, এই দিন দেখলাম একটা পুলারে ইচ্ছামতো থাপ্রাইতাছে! সে কি চড় ভাই, পুলাটার গাল পুরাই লাল আলুর মতো হয়ে গেছিলো। আপনি কি কথা বলতে চান ভাই? এই মিয়া এতো কথা কউ ক্যান, আমি কথা কইতে চাইছি? ফাজিল কোথাকার, বড় ভাই পত্রিকা ছেড়ে চলে গেলো, সালায় একটা জানোয়ার, এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখছে! পাঠ্য বই না পইড়া পত্রিকা পড়ে! মনে হয় এই জায়গা থেকেই পরীক্ষায় লিখবো। আঁতকে উঠলাম, কেমন পশু এদের জন্য দিয়েছে, ভাবতে ভাবতেই দেখলাম কয়েক ফোটা চোখের জল ধর্ষণের বর্ণনা দেওয়া জায়গাটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। তবে কি অপু ভাই এটা পড়ে কান্না করছে? মানুষটাকে দেখে বুঝতে পারিনা একটুও। একটা গোমড়া চুপচাপ মুখে কোথায় এতো প্রেম, দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে কে জানে? হৈমন্তী এখনো বসে আছে পত্রিকা পড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে মেয়েটাকে দেখছি। এটা পুরুষের আগ্রহ! সব পুরুষের না, যারা রহস্য দেখে আঁতকে উঠে তাদের! অথবা যারা শুধু শরীর বুঝে তাদের! মেয়েটার হাতে একটা পাউরটি, ছিঁড়ে, ছিঁড়ে পুরুরে ঢিল দিচ্ছে, কয়েকটা বাচ্চা তেলাপিয়া ঝাঁপিয়ে পরছে তাতে। হৈমন্তী কেনো এটা প্রতিদিন করে? আজ জিজেস করা যেতে পারে, কিন্তু যে রাগি মেয়ে সামনে কি দাঁড়াতে পারবো? এই যে শুনুন, এটা আমার জায়গা, আমার জায়গা মানে কি? এখানে প্রতিদিন সকালে বসে আমি দাঁত ব্রাশ করি। তারপর রাত দশটায় চাঁদ দেখার জন্য বসে থাকি! তাই এটা... আপনিও চাঁদ দেখেন? এটা কেমন প্রশ্ন? অনেকেই চাঁদ দেখে, না মানে চাঁদ দেখতে আমি খুব পছন্দ করি। মেয়েটা কপাল তুলে তাকালো, কপাল তুলে এ জন্যই বলছি যে, একটা ছেট্ট কালো টিপ থাকলে, কপালে চোখ আটকে যাবেই! যেমন রাগি ভাবাইলাম তেমনটা না, যাক নির্ধাত থাপ্পর থেকে বাঁচা গেলো! এই ধরেন, আপনার জায়গা! আপনি বসবেন না? হৃষ্ম, আরেকটি পাউরটি কিনে আনি, তারপর কথা হবে! আমি বসে আছি, মাছগুলো এখন চুপ! একটা ছাতিম গাছ কেবল যুবতি হচ্ছে! ডালে বসে আছে কয়েকটা পাখি! ওদের একটার নাম জানি, শালিক! ছাতিম গাছকে প্রতিদিন দেখে মুখস্থ করে ফেলছি... স্টিলের প্লেটে টাঙ্গানো আছে এর ইংরেজি নাম, “Blackboard Tree” তারপর এই পাশ্টো রাস্তার পাশে সারিবাঁধা মেহগনি গাছে, ইংরেজি নাম “Amirican Mehagoni” আর এই রোড়টার নাম রাখা হইছে সেক্সি রোড! আজব না? কার ভাত কে খেয়ে নাম বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে! আজ এখানে সেক্সি রোডে কপোত, কপোতি নামেনি। তাই এখানে ভাত কুড়াচ্ছে কয়েকটা চড়ুই পাখি। হৈমন্তী পাউরটি হাতে নিয়ে ফিরে এসেছে, দাঁতে লেগে আছে ক্ষণজ্ঞায়ী একটা হাসি। ধরেন, অর্ধেক আপনার পাউরটি হাতে নিয়ে খাওয়া শুরু করতেই... এই কী করেন, এটা মাছকে খাওয়ানোর জন্য দিছি, রাক্ষস কোথাকার! মাছকে...? হৃষ্ম, ওদের কি আমার থেকেও বেশি ক্ষুধা লাগছে? হৃষ্ম, দেখেন না, কেমন লাফাচ্ছে? তাড়াতাড়ি খাওয়া, মেয়েটাকে দেখে রহস্যের শেষ হচ্ছে না। কিছুদিন আগেও তো পুরো ক্যাম্পাস মাতিয়ে চলতো। কেমন বিকেল, রাত না মানা আড়তায় সময় কাটাতো, এখন একাই থাকে, চুপচাপ, মাথায় বেগী, অলংকারের জঙ্গলমুক্ত একটা মানবী। আর কি রকম যেনো সব কিছুতেই শালিনতা। ক্লাস করবেন না? না, তাহলে ক্যাম্পাসে কেনো? মাছকে খাওয়াতে! কখন চলে যাবেন? সদ্যে নামলে, ওহহ, আপনি কি আজকেও চাঁদ দেখবেন? হৃষ্ম, চাঁদ দেখতে কি খুব ভালো লাগে? কখনো, কখনো। মনের অবস্থার উপর এটা নির্ভরশীল। আমি কি আসবো চাঁদ দেখতে? না, কোন সমস্যা? হৃষ্ম, এক সাথে এ রকম বয়সের দুজনকে দেখলে বড় ভাইরা পাছায় লাথথি মেরে হল থেকে বের করে দিবে! বড় হওয়া কি অন্যায়? হৃষ্ম, আচ্ছা, যাই তাহলে, ভালো থাকবেন। কাল আবার দেখা হবে। ঘাটলার সিডি বেয়ে হৈমন্তী চলে যাচ্ছে। নৃপুর থাকলে হয়তো ভালো হতো। অনেক দিন পর ঝুনঝুন শব্দ শুনতে পারতাম। যুবতি ছাতিম গাছটায় অন্ধকার চেপে বসেছে। তৃষ্ণা এখন কল দিবে, শাসন করবে, রাগ দেখাবে, তারপর মিষ্টি করে বলবে, এই ভালোবাসি তোহহ, আমি ছাড়া কে জ্বালাবে তোমাকে!

লেখক : ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭



বৃক্ষবন্ধু লক্ষ্মী দত্ত

গাছের প্রতি তার চরম বিত্তওঁ। জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত অ্যাটনের জন্য সে একমাত্র অপরাধী মনে করে গাছকে। ছেলেটির নাম বৃক্ষ। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা একজন সফল ব্যবসায়ী আর মা গৃহিণী ও প্রকৃতি প্রেমিক, গাছের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা। তাদের বাড়ির তিন ভাগ জায়গা জুড়েই ছিল নানা ধরনের গাছ। বৃক্ষের মায়ের কাছে সমস্ত গাছের শুরুত্বই যেন আকাশছোঁয়া। মায়ের সাথে বৃক্ষও হোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি তীব্র ভালবাসা নিয়ে বেড়ে উঠেছে। নানা ধরনের গাছ সংগ্রহ করে বেড়াতো মা আর ছেলে দুজনে। তার বাবা কখনো মা ছেলের পছন্দের উপর হস্তক্ষেপ করেনি। একদিন বৃক্ষ ও তার মা পরিকল্পনা করল, যেদিন তাদের বাগানের এক হাজার প্রজাতির গাছের বাস হবে, সেদিন তারা এক হাজার মাইল দূরে সবুজের সমারোহ সৃষ্টির অংশীদার হতে যাবে। আর এই সমারোহের অংশীদার হওয়ার জন্য তারা প্রতি এক মাইল একটি করে গাছ লাগাবে। এরপর শুরু হলো তাদের অপেক্ষা। অপেক্ষার প্রথম গুণতে একদিন চলে এল সেই মহেন্দ্রক্ষণটি। মা আর ছেলে বেরিয়ে পড়লো সবুজ সমারোহের সাক্ষী হতে। নাম না জানা পথে, প্রতি মাইলে তারা একটি করে গাছ লাগিয়ে চলেছে। এরপর তারা আবার গাড়িতে চড়ে রওনা দিল পরবর্তী গন্তব্যের পথে। এভাবে ২৬৮টি গাছ লাগিয়ে ফেলল। ২৬৯ নম্বর গাছটি লাগানোর জন্য তারা গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়িটি তার আপন গতিতে চলতে শুরু করেছে।

বৃক্ষ ও তার মা অধীর আছাহে অপেক্ষা করতে লাগল তাদের পরবর্তী গাছের নতুন পথ চলার সাক্ষী হওয়ার জন্য। এমন সময় বৃক্ষের মা প্রচঙ্গ পানি পিপাসায় গাড়ির ড্রাইভারকে পাঠালো পানি নিয়ে আসতে। বৃক্ষ ও তার মা গাড়ি থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কিন্তু ড্রাইভার এখনো আসছে না। এদিকে তাদের এখনো অনেক পথ যাওয়া বাকি। তাই বৃক্ষ তার মাকে বলল, মা তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো আমি ড্রাইভার চাচাকে নিয়ে আসছি।

বৃক্ষ কিছুদূর এগুতেই দেখল তার ড্রাইভার চাচা পানি নিয়ে এগিয়ে আসছে। তারা প্রায় গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। দূর থেকে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছে বৃক্ষ। এগিয়ে যাচ্ছে সে, এমন সময় সে খেয়াল করল কড়ই গাছের একটি শাখা ভেঙে পরছে। ঠিক তার নিচেই রয়েছে তাদের গাড়িটি আর গাড়িতে তার মাকে বসিয়ে এসেছে। সে তৎক্ষণিক মা...মা বলে চিন্কার করে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে গাছের শাখাটি গাড়িটির উপর পড়ে যায়। গাড়িটি দুরের মুচের যায়। বৃক্ষ দৌড়ে গাড়ির সামনে গিয়ে বাকরুদ্ব হয়ে গেল। দেখলো তার মা গাছের শাখার নিচে চাপা পড়ে আছে। বৃক্ষ তার ড্রাইভার চাচাকে সঙ্গে নিয়ে গাছটি সরিয়ে মাকে বের করল। কিন্তু ততক্ষণে বৃক্ষ, তার মাকে হারিয়ে ফেলেছে। মাকে হারিয়ে বৃক্ষ পাথরের ন্যায় স্তুর। বৃক্ষের মনে এক অজানা ঘৃণা কাজ করতে থাকে। আর সেটা গাছের প্রতি। বৃক্ষ যাকে পরম বন্ধুর স্থান দিয়েছিল সেই গাছকে তার চোখের বালি মনে করা শুরু করল। বৃক্ষ বাড়ির সমস্ত গাছ উপড়ে ফেলল। পৃথিবীর সমস্ত গাছকে মাতৃহত্যার অপরাধী মনে হতে লাগল তার।

বছর ঘুরে আজ সেই ভয়ংকর দিন। যেদিন বৃক্ষ তার মাকে হারিয়ে ছিল। খুব মনে পড়ছে তার মায়ের কথা আর ততই ঘৃণা হচ্ছে গাছের প্রতি। সব মনে পড়ে যাচ্ছে তার, মায়ের সাথে কাটানো শৃঙ্খিগুলো এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দুজনের মিলে একটি একটি চারা রোপণ, একত্রে পরিচর্যা- এরকম আরো কত কী!

তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। বৃক্ষ অনেক কিছু ভাবছে, কিভাবে মায়ের হত্যার জবাব দিবে। মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা টগবগ করে ফুটছে অস্ত্র আআয়। বৃক্ষ মনে করে না, তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সে মনে করে গাছ তার মাকে হত্যী করেছে। এসব ভাবতে ভাবতে বৃক্ষ ঘুমিয়ে পরে। ঘুমের মধ্যে কার যেন একটা কঠ শুনতে পায়। কঠটা অবিকল তার মায়ের মতো শুনাচ্ছে। মা যেন বলছে- ‘বৃক্ষ তুমি ভুল করছ। আমি অনেক কঠ পাচ্ছি। আমি বৃক্ষমাতার কাছে পরম শাস্তিতে আছি আর তুমি সে বৃক্ষমাতাকে কঠ দিয়ে আমাকেও অনেক কঠ দিচ্ছ। ভুল করছ তুমি...ভুল করছ বাবা...’।

বৃক্ষ লাফ দিয়ে উঠে বসে। সে ভাবতে থাকে- কী শুনল সে? সে কি কোনো দুঃস্ময় দেখেছে, নাকি সত্যি কেউ তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে! বৃক্ষ জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, তাহলে এতদিন কি সে ভুল করেছে? না বুরোই গাছদের দিনের পর দিন কঠ দিয়েছে...! অজানেই সে মায়ের কঠের কারণ হয়েছে। এসব ভেবে তার নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। সে ঠিক করল, না সে আর গাছদের দোষী মনে করবে না। সে গাছদের মাতৃজ্ঞানে পরিচর্যা করবে। সে বুবতে পেরেছে, প্রতিটা গাছের মধ্যে তার মা ঘুমিয়ে আছে।

বৃক্ষ আজ আবার নতুন করে গাছদের বন্ধু ভাবতে শুরু করেছে।

লেখক : হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯



অন্যরকম নাজমুল হাসান

দিন শুরু হয় আর দশটা সাধারণ দিনের মতোই, কিন্তু শেষ হয় অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা দিয়ে।

ভাসিটি বন্ধ তাই একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করি। কয়েকদিন যাবত ল্যাপটপটার যেন কী হয়েছে। ৩ মাসের ওয়ারেন্টি এখনো আছে তাই দোকানে নিয়ে যাই। দোকানটা হচ্ছে টাঙ্গাইল ক্যাপসুল মার্কেটে। দেওয়ার পর টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে বসে চা খেতে খেতে ভাবছি—আজ এখন বাসায় যাবো না। সারাদিন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করবো, যেখানে ইচ্ছা যাবো, অটো বা রিক্সায় উঠবো না।

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা শুরু করলাম ব্যস্ত শহরের রাস্তা দিয়ে। সবাই ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে সবার মধ্যে ট্রেন ধরার তাড়া। হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধ মহিলা রাস্তা পার হতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। যখন ভাবছি রাস্তা পার করে দেই তখনি সে রাস্তা পার হয়ে গেলো। যাই হোক আমি হাঁটছি, সামনে দেখি জজ কোর্ট, আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখার মতো একটি দৃশ্য— এ যেনো এক মাছের বাজার। অসংখ্য উকিল বসে আছে, মাছের বাজারের মতো দরদাম হচ্ছে। কিছুক্ষণ আসামী আর উকিলদের বেচাকেনা দেখে চলে যাই এসপি পার্ক, সেখান থেকে টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কিছুক্ষণ অসুখ মানুষ দেখে আসি। অনেক কিছুই দেখলাম তার মধ্যে যে বিষয়টা দেখে বেশি খারাপ লাগলো তা হলো—আমার বয়সের এক ছেলে লাঠি নিয়ে হাঁটছে, এক পা নেই। তখন ভাবলাম, আমি কতইনা ভালো আছি। বের হয়ে বসলাম ডিসি লেকে দেখি ৪ জন বাচ্চা টাকা তুলছে (ভিক্ষা) তাদেরকে এখনি এসপি পার্কে দেখে আসছি। দেখে মায়া হয় এইটুকু বাচ্চা বয়স আর কত হবে ৬-৮ বছর হয়ত।

যাই হোক লোকেশন ঠিক করে ফেললাম আতিয়া জামে মসজিদে যাবো। ডিসি লেক থেকে গুগল ম্যাপ অনুযায়ী ১৩ কি.মি. রাস্তা হেঁটে যেতে সময় লাগবে ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, তখন হাঁটতে শুরু করলাম। ১ ঘণ্টার উপর হাঁটার পর বরটিয়া বাজারে হালকা কিছু খেলাম। খেয়ে বের হতেই একটা ঘটনা ঘটলে, তখন সময় ৪টার মত হবে। ৮-৯ বছরের একটা ছেলে পাশে সাইকেল নিয়ে পড়ে আছে, উঠার চেষ্টা করতেছে কিন্তু পারতেছে না। আমি উঠাতে গিয়ে দেখি বাম পা ভেঙে গেছে। তখন তাকে কোলে নিয়ে অন্য একজনের সাইকেলের পিছনে বসে তার বাসায় যাই। সেখানে আরেক সমস্যা কেউ বাসায় নাই, কিছুক্ষণ পর সবাই যদিও এলো কিন্তু বাসায় তার বাবা ছাড়া কোন ছেলে মানুষ নাই। বাপকে দেখি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমি বারবার বলছি ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যেতে হবে, পা ভাঙ্গে। সেই দিকে কেউ খেয়ালই করে না।

তাই আমি দেরি না করে তাকে আবার কোলে নিয়ে বের হয়ে আসতেই দেখি একটা অটো, আমি ছেলের বাবা মা আর অটো ড্রাইভারকে নিয়ে সোজা টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে আসি। ভর্তি করার পরে ডাক্তার একারে করার জন্য বলে। তখন সোনিয়া ক্লিনিকে নিয়ে এক্সের করে এনে ৯ম ওয়ার্ডে বসে আছি। এখন রক্ত লাগবে (এ+) কিন্তু আমার (বি+)। তার মাকে পরীক্ষা করা হলো। তার মার সাথে রক্তের ঝঃপ মিলে যায়, তাই তিনিই রক্ত দেন। আমার সাথে মিললে আমিই দিতাম। ছেলেটার উপর মায়া জন্মে গেছে, এত শক্ত ছেলে খুব কমই আছে। তার পা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই কিন্তু তাকে দেখে বুঝার কোন উপায় নাই যে তার পা ভেঙে বুলে আছে। একটা বারের জন্যেও কান্না করে নাই। যখন তাকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছলাম সে ব্যথার কথা ভুলে আমাকে বলছে—কিছু হবে নাতো? মাকে কিছু বইলেন না—মা শুনলে মারবে। মা সাইকেল চালাইতে না করছে, এইটা অন্য জনের সাইকেল। আমি তখন তাকে কী বলবো, কী বলে সাত্ত্বনা দিব খুঁজে পেলাম না।

আমার আর আতিয়া মসজিদ দেখা হলো না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝেছি—কারো উপকারে আসতে পারার আনন্দের কাছে বাকি সব আনন্দই তুচ্ছ।



শেষ ঠিকানা

সজিব মিয়া

পুরনো টিনের চালা। পাশে বাঁশের ভাঙা চাটাই দিয়ে বেড়া দেওয়া। বাঁশের মাচা করা মাটি থেকে একটু উপরে দোকানটি। সামনে সাইনবোর্ডটি অনেক দিন আগে দেখে বোৰা যাচ্ছে। সাইনবোর্ডে লিখা শেষ ঠিকানা, ঠিকানা এর ‘আ’ কারটা তেমন বোৰা যায় না। তাই যা লিখা আছে তা পড়লে হবে ‘শেষ ঠিকান।’ দোকানের পাশে বেশ কিছু বাঁশের চাটাই রয়েছে। পিছনে পুকুর। দোকানের ভিতরে বেশ বয়স্ক লোক কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে। পিছনের কাঠের তাকে মোম, আগরবাতি, কিছু সাদা কাপড় ইত্যাদি রয়েছে। লোকটির মুখে চিঞ্চার ছাপ বেশ স্পষ্ট।

কী খবর রমিজ মিয়া? ছেলের জুর কমছে?

এখনো কমে নাই, ভাই। বেচা-বিক্রি কম হইতেছে। হাতে ট্যাকা নাই, যা আছিল তা দিয়া বাঁশ কিনা রাখছি। পোলাড়ারে যে ডাক্তার দেহামো হে ট্যাকাও নাই। এর মধ্যে ধার দেনা তো আছেই।

হুম বুঝি তো, কী আর করার কও। সবার একই অবস্থা। দুপুর পার হইয়া আইলো, যাও বাঢ়ি যাও।

রমিজ বাঢ়িতে যেতে চায় না। অভাবের সংসার। তার ছোট ছেলে বেশ কয়েক দিন জুরে বিছানায় পড়ে আছে।

বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও ছেলের জন্য বাড়ি গেলেন রমিজ মিয়া। ছেলেকে চিকিৎসা না করাতে পারার অপরাধবোধ মনে নিয়ে ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন। স্ত্রী জমিলা ছেলের পাশে বসেছিলেন। রমিজ মিয়াকে দেখে তাকালেন একবার। তারপর আবার ছেলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ছেলের দিকে তাকিয়েই বললেন,

কিছু কি বেচা হইছে? ট্যাকা পাইছেন কিছু?

রমিজ চুপ করে আছে। আর তাতেই জমিলা বুঝো যায় যে, আজকেও কিছু বিক্রি হয়নি। জমিলা রমিজ মিয়ার এমন অনেক কথাই বুবাতে শিখেছে যা মুখে বলতে হয় না। বলার আগেই বুঝে নেয়। অভাব হলেও তারা আগে সুখেই ছিল। তাদের ছেলে জন্য হওয়ার আগে তারা গ্রামে থাকতো। ছেলের জন্য হওয়ার পরের বছরই বন্যায় নদীর পানির স্রোতে বসতবাড়ি ভেঙে যায়। আর তারা এই মফস্বলে এসে পুরনো এই দোকানটি তার পরিচিত লোকের কাছ থেকে ধার দেনা করে কিনে নেয়। গোসল সেরে খেতে বসলে রমিজ জমিলাকে জিজেস করে-

ও কিছু মুখে দিছে?

না কিছু মুখে দেয় না। আজকে সকাল থ্যাইকা অবস্থা আরো খারাপ। কথাও কম কয়। কেমন পোলাড়া আমার হাসতো খেলতো। এহন কয়দিন ধইরা বিছানায় পইড়া রইছে। আপনারে কইলাম এই ছোট ডাক্তার দিয়া হইবো না, বড় হাসপাতালে নিয়া বড় ডাক্তার দেখান লাগবো।

রমিজ আর খেতে পারলো না।

বন্যায় সব ভেসে গেছে। টাকা যা ছিল দোকানটার পিছনে খরচ করেছে। এখন ছেলের এই অবস্থায় কার কাছে টাকা চাইবে, কেউ পরিচিত হয়ে উঠেনি যে, চিকিৎসার জন্য এত টাকা ধার দিবে। খাবার সরিয়ে উঠে পড়লো রমিজ। জমিলা বলল, খাবারটা শেষ করে যাও।

রমিজ কিছু বলল না। ছেলের কাছে গিয়া বসল। কপালে হাত রেখে শরীর যে গরম হয়ে আছে পূর্বের থেকে অনেক বেশি তা বুবাতে পারল।

মাথায় কয়েক বার হাত বুলিয়ে দিয়ে রমিজ বলল, বাবা আমি তোমারে বড় হাসপাতালে নিয়া যামু চিত্তা কইরো না।

রমিজ দোকানের দিকে রওনা দিল আর ভাবতে লাগলো, পৃথিবীটা কতই জটিল। অপরিচিত লোকগুলো মারা যাবে তাদের জন্য বাঁশের চাটাই, কাপড় কিনবে। সেই টাকা দিয়ে আমার ছেলের চিকিৎসা হবে? যে কথা কেউ ভাবে না সেই কথা রমিজ ভাবলো যে, আজকে যেন কেউ মারা যায় আর তার দোকানে আসলেই কম মূল্যেই সে যা চাইবে রমিজ তা বিক্রি করবে।

বর্ষার শুরু তখন, বৃষ্টি শুরু হলে পড়তেই থাকে। থামার কোনও নাম নেই। রমিজ দোকানে যাওয়ার সাথে সাথেই ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। দোকানের সামনের পাল্লাটা নামিয়ে দিল যাতে বৃষ্টির পানি দোকানে না যায়। আর আসার সময় যে কথা ভাবছিল তা আবারও ভাবতে লাগলো। দুর্বল শরীর, হালকা শীতে রমিজ ঘুমিয়ে গেল। ঘুমে দেখছিল অনেক মৃত মানুষ তার দোকানের চারপাশে রাখা, তাদের সবার শেষ বিদায়ের যাবতীয় জিনিস তার দোকান থেকে নেওয়া হবে। সে মৃত লাশ অতি উৎসাহের সাথে গুণছিল। হঠাৎ থেমে যায়। দেখে একটি ৫/৬ বছরের ছেলের লাশ। সে কাছে গিয়ে দেখে দুপুরে যার কপালে হাত রেখেছিল সেই ছেলেটি এখানে শুয়ে আছে।

রমিজের ঘুম ভেঙে গেল। আবহাওয়া শীতল হলেও তার শরীর ঘামে ভিজে গেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তেছে। পিছনের পুরুরে ব্যাঙ অনবরত ডেকে চলছে। হঠাৎ কারো দ্রুত দোকানের দিকে আসার শব্দ পেল সে। মনে মনে ভাবলো ক্ষতি হলেও কম মূল্যেই সব বিক্রি করবে লোকটির কাছে। দোকানের পাল্লা উপরে উঠিয়ে দেখলো, তার পাশের বাসার রিক্সাচালক কাদের আসছে।

ভাই দোকান থেকে আগরবাতি, কাপড়, চাটাই বের করে আমার রিক্সায় উঠেন তাড়াতাড়ি। ভাবি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

কী হইছে জমিলার? আর আমার পোলা? রাশেদ?

রিক্সায় বহেন আমি সব গোছাইয়া নিয়া যাইতাছি। বহেন তাড়াতাড়ি।

লেখক : তয় বর্ষ, গণিত, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯





তয়

সুমাইয়া রহমান স্বণা

ভীতু ও ভীতু বলে বাবলুরা যাকে ডাকছিল তার নাম তমাল, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।

তমাল বাবলুদের সহপাঠি, খুব শান্ত চুপচাপ ও ‘ভীর’ প্রকৃতির, ভূত প্রেতে ওর খুব ভয়।

তাই বন্ধুরা সবাই মিলে তমালকে ভীতুর ডিম বলে ডাকে। তমাল ও বাবলু একই এলাকার, পাশাপাশি বাড়ি ওদের। তমালদের কলেজ শীতের অবকাশে ছুটি দিয়েছে ৭ দিন। শীতের বিকেলে দু-বন্ধু হলুদের রঙে রাঙানো সরিষা ফুলের মেঠো পথ দিয়ে গল্প করতে করতে হাঁটছিলো।

তমাল : কলেজ তো ছুটি দিলো অনেকদিন, কোথাও যাবি বাবলু?

বাবলু : হ্যাঁ, মামার বাড়িতে পিঠা-পুলির দাওয়াত দিয়েছে আমাদের। কাল সকালে রওনা দিবো। তুই কোথাও যাবি না তমাল?

তমাল : না।

বাবলু : তাহলে আমার সাথে মামার বাড়ি চল যাই।

তমাল : না বে, তুই ঘুরে আয়।

হঠাতে করে বাবলুর মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি হানা দিলো। বাবলু তমালকে বললো মামার বাড়ি যখন আমার সাথে যাবি না, ছুটির এই কয়েকদিন তোর সাথে আমার দেখা হবে না। মনটা অনেক খারাপ লাগছে আমার। এই কথা বলে বাবলু মুখখানা বাংলার পাঁচের মতো করে নিলো।

তমাল বাবলুর মন খারাপ দেখে বলল, কী করলে তোর মন ভালো হবে? বাবলু বলল যা বলব তাই করবি? তমাল বলল আচ্ছা বন্ধু যা বলবি, আমি করব। বাবলু বলল আমার অনেক দিনের ইচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনে যে পোড়াবাড়ি আছে ওই পোড়াবাড়িতে যাবো আমি। তমাল বললো, ওই বাড়িতে যায় না বন্ধু, কতো বছরের পরিত্যাক্ত অনেক কিছু থাকতে পারে, তুই যাসনে। বাবলু বলল আমি যাবো তুইও যাবি, দিনের বেলা যেতে পারবো না কেউ দেখলে যেতে দিবে না তাই রাতে যাবো। তমাল তয় পেয়ে বলল না বন্ধু আমাদের কারোই যাওয়া ঠিক হবে না বাবলু বলল তুই আমাকে কথা দিয়েছিস, মন ভালো করার জন্য যা বলব, তাই করবি। তমাল নিরপায় হয়ে বলল আচ্ছা যাবো। বাবলু তমালকে রাত একটায় পোড়াবাড়িতে যেতে বলে। বাবলু তমালের জন্য পোড়াবাড়ির সামনে অপেক্ষা করবে, এ বলে যে যার বাড়িতে চলে যায়। তমাল রাত একটা বাজতেই শীতের কনকনে ঠাণ্ডা কুয়াশায় ঘেরা ঘুটমুটে অন্ধকারে হাতে হারিকেন নিয়ে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ভয়ে ভয়ে পোড়াবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়, কিন্তু বাবলুকে কোথাও দেখছে না। তমাল তার হাতে থাকা হারিকেনটি মুখের সামনে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পোড়াবাড়ি গেটের সম্মুখে। বাবলুকে ডাক দিতে যাবে এমন সময় এক দমকা হাওয়া এসে তমালের গায়ে থাকা চাদর মাটিতে পড়ে যায়। তমাল চাদরটি তুলে হাতে নেওয়ার পর অনুভব করল তার পায়ে নরম তুলতুলে কিছুর ছোঁয়া লাগছে। ক্ষণিকের মধ্যে তমালের গা শিউরে উঠে। তমাল তার পায়ের দিকে তাকাবে এমন সময় তমালের চোখের উপর কয়েকটি চুল দেখতে পায়। তমাল চিংকার দিতে চায় কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না, মুহূর্তমধ্যে তমাল মাটিতে পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তমাল একটি ডাক শুনতে পায় “মিউ”। তমালের পাশে একটি বেড়াল ছানা বসে লেজ নাড়াচাড়া করছে। তমালের পায়ে যে নরম তুলতুলে কিছুর ছোঁয়া লাগছিলো ওটা বেড়াল ছানার লেজ।

তমাল বেড়াল ছানাকে দেখার পর নিজের চুল ঠিক করতে গিয়ে বুবাতে পারে তমালের চোখের উপর যে চুল পড়ছিল সেই চুলগুলো তমালের নিজের চুল। তমালের চুল গুলো ছিলো কাঁধ বরাবর। তমাল বাবরি চুল রাখতে পছন্দ করে। কানের কাছে গুজে রাখা চুলগুলো তমালকে ভয়ে গুটিয়ে দিয়েছিলো। তমাল ভয়ের কারণগুলো বুবাতে পেরে এক ঘন্থির নিঃশ্঵াস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তবে

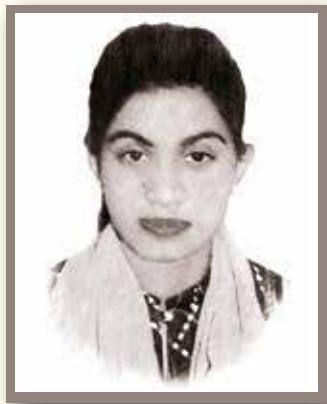
এখানে কি তমালের ভয়ের শেষ?

পরের দিন সকাল বেলা বাবলু, মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ট্রেনে উঠার পর ট্রেনের জানালা দিয়ে বাবলু তমালকে দেখতে পায়। তমালকে রাতে পোড়াবাড়ি যেতে বলেছিলো, তমাল কি রাতে গিয়েছিলো? এই কথা ভাবতে ভাবতে বাবলুর ট্রেন ছেড়ে দেয়। বাবলু জানালার বাহিরের দিকে তাকালে দেখতে পায় তমাল ওর দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাবলু মামার বাড়ি যাওয়ার পরের দিন বাবলুর দাদা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে, যার কারণে বাবলুকে একদিন পরেই মামার বাড়ি হতে চলে আসতে হয়। বাবলুর মামার বাড়ি হতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে বাবলুর সামনে তমালকে দেখতে পায়, রাগান্বিত দৃষ্টিতে বাবলুর দিকে তাকিয়ে আছে। বাবলু ভয়ে ভয়ে তমালের কাছে গিয়ে কানে ধরে বলল আমাকে ক্ষমা করে দে বন্ধু, আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আমার মনে ছিলো না। তমাল এক গাল হাসি দিয়ে বলল আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিস? বাবলু এবার ভয় কাটিয়ে অটহাসি দিয়ে বলল ভয় পাবো, তোকে দেখে হা হা হা...। ভীতুর ডিমকে দেখে আমি ভয় পাবো। তমাল বলল চল তাহলে। বাবলু বলল কোথায় যাবো এই সন্ধ্যার সময় “তমাল বলল তুই তো খুব সাহসী, আমাকে ওই পোড়াবাড়ী নিয়ে যাবি। আমি তো ভীতুর ডিম। বাবলু বলল ভীতুর ডিমের আবার এ সন্ধ্যায় পোড়াবাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। এই বলে বাবলু হাসতে হাসতে বলল আচ্ছা কাল সকালে যাবো। এখন বাড়ি যাই বন্ধু। তমাল বলল এই তোর সাহসীকতা, তুই তো আমার থেকেও ভীতু। বাবলু এবার রেগে গিয়ে বলল আচ্ছা চল তুই। তমাল আর বাবলু পোড়াবাড়ীতে যেতে যেতে চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। দুজনে পোড়াবাড়ীর ভেতরে চুকলো, তমাল বলল চল বাবলু এই শীতের রাতে এই পোড়াবাড়ীর ছাদ থেকে চাঁদ দেখব আর একসাথে অনেকগুলো জোনাকি দেখতে পাবো। বাবলু বলল তোর মনে এতো রং ঢং আছে পোড়াবাড়ীতে না আসলে জানতেই পারতাম না বন্ধু এই বলে দুজন হাসতে হাসতে পোড়াবাড়ীর ছাদে উঠছে।

ছাদে আসার পর বাবলু বিস্মিত হয়ে যায়, চিলেকোঠার দেয়ালে গা হেলিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোক যার প্যান্টের নিচের অংশ তারের সাথে জড়িয়ে আছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকায় বোবার উপায় নেই লোকটি কে? বাবলুর মা : কোথায় তুই? রাত হয়ে এসেছে, বাড়িতে কেন আসছিস না? বাবলু : মা আমি পোড়াবাড়ির ছাদে তমালের সাথে আছি। সাথে আরও একজন লোক আছে, কিন্তু লোকটি পেছন ফিরে থাকায় লোকটিকে চিনতে পারছি না, এই বলে বাবলু লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তৎক্ষণাৎ বাবলুর মা বিস্মিত কর্তৃ বলে উঠলেন, তুই তমালের সাথে কিভাবে থাকতে পারিস! আমি তমালের লাশের পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। কথাটি শোনার পর বাবলু বাকরংক হয়ে যায় এবং বাবলুর হাত থেকে ফোন পড়ে যায়। বাবলু লোকটির সামনে যেতেই বাবলু মাটিতে বসে পড়ে। কারণ বাবলুর সামনে তমালের দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মৃত লাশ ছিল। বাবলু উঠে পালাতে চাইছে। কিন্তু বাবলুর মনে হচ্ছে পায়ের নিচে কেউ আঠা লাগিয়ে দিয়েছে। বাবলু চিংকার করতে চাইছে, পারছে না। বাবলুর মনে হচ্ছে বাবলুর গলা কেউ চেপে ধরে আছে। বাবলু উঠে দৌড় দেওয়ার পর একই তারের সাথে জড়িয়ে পুনরায় পড়ে যায়। কিন্তু ভয়ের কারণে বাবলু মনে করে তমালের লাশ তার পা টেনে ধরে ফেলে দিয়েছে মেরে ফেলার জন্য। হঠাৎ পেছন থেকে বাবলু কানার শব্দ শুনতে পায়, সাথে শুনতে পায় আমাকে মেরে ফেললি বাবলু? এবার তোকেও মরতে হবে। বাবলু না বলে চিংকার দিয়ে ঘুম থেকে ওঠে পড়ল। সামনে তমাল বসে ছিল। তমালকে দেখার পর বাবলু ভূত ভূত বলে আবারও চিংকার শুরু করল। তমাল অটহাসি দিয়ে বলে, আমি ভূত না আমি তমাল। তুই স্বপ্ন দেখছিলি।

লেখক : বিবিএ (অনার্স), তৃয় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯





পোড়া হাড় সানজিদা মেহের নাহিদা

বাড়ির সামনে ছোট পেয়ারা গাছের নিচে বসে রোদ পোয়াচ্ছে মোস্তফা সাহেব। তার পাশেই এক টেবিলে মানুষের কিছু হাড়। খুব অত্যন্ত দৃশ্য হলেও গ্রামের মানুষের কাছে এটি এখন স্বাভাবিক। তিনি যেখানেই যান হাড়গুলো তার সাথেই থাকে।

খুব ছোট বয়সে বাবা-মাকে হারানোর পর একমাত্র বোনকে নিয়ে তার সংসার ছিল পঞ্চাশ বছর আগে। কত যে ভালোবাসা ছিল দুই ভাই বোনের মধ্যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সুখে দিন কাটছিল মোস্তফা মিনুর। কিন্তু হঠাৎ দেশে যুদ্ধের দামামা বাজলো। সবকিছু এক মুহূর্তেই বদলে গেল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে মোস্তফা সিদ্ধান্ত নিল সে যুদ্ধে যাবে, নতুন একটি দেশ পাওয়ার জন্য তাকে যুদ্ধে যেতেই হবে। কিন্তু একমাত্র বোনকে ফেলে যেতে তার মন সায় দিছিলো না।

কিন্তু মিনু যেদিন বলল, ‘ভাইয়া তুমি যুদ্ধে যাও, আমার জন্য নতুন পতাকা নিয়ে এসো’ সেদিনই মোস্তফা বেরিয়ে পরলো। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মোস্তফা বাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে। দৃঢ়সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা। এখন পর্যন্ত তার নেতৃত্বে প্রতিটি অপারেশনেই বাঙালি বিজয় পেয়েছে। ছোট বোনের মুখ যতবারই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মোস্তফা যেন নতুন উদ্যম পায় ততবার। একদিন হঠাৎ করেই মোস্তফার কাছে সুযোগ এলো বোনের সাথে দেখা করার। মোস্তফা এক মুহূর্ত দেরি না করে খুব সতর্কে বোনের সাথে দেখা করতে দেল।

কিন্তু একি! বাড়ি কোথায়। সব তো পুড়ে ছাই। ছাই থেকে এখনো মানুষের পোড়া মাংসের গন্ধ বের হচ্ছে। মোস্তফা যুদ্ধে যাওয়ার খবরে শ্বানীয় রাজাকারণা পাকিস্তানের মোস্তফার বাড়িতে নিয়ে আসে। তারা মিনুর ওপর নারকীয় অত্যাচার করে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলে। পোড়া ছাই হাতড়ে মোস্তফা মিনুর কয়েকটা হাড় আর দু'গাছ চুড়ি পায়। সেগুলো সাথে নিয়েই মোস্তফা আবার যুদ্ধে ফেরে। যে যুদ্ধে মোস্তফা তার বোনকে হারালো সে যুদ্ধ তাকে শেষ করতেই হবে; দেশের প্রতিটি মিনুকে সে বাঁচাতে চায়।

মিনুকে তো মোস্তফা নিজের কাছে রাখতে পারেনি কিন্তু সেদিনের পর থেকে মিনুর হাড়গুলোকে সে সবসময় নিজের কাছে রেখেছে। হাড়গুলোর সাথে তিনি প্রতিদিন হাঁটতে বের হন, রোদ পোহান আর যুদ্ধের গল্প শোনান। মিনুকে যেখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সেখানের ছাই থেকে একটি বকুল গাছ জন্মেছে। মাঝে মাঝে মোস্তফা সাহেব বকুল গাছের তলায় মিনুর হাড়গুলোকে ছড়িয়ে রেখে গল্প করেন; যুদ্ধের গল্প, নতুন দেশের গল্প, বোনের সাথে কাটানো পুরনো দিনের গল্প।

লেখক : সমান, সমাজকর্ম, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯





অপেক্ষা

সিমা খান সুখি

সেদিন আন্টিকে বললাম, শিশুকে এখন থেকে এক ঘটা দেরি করে পড়াতে আসব। আন্টি জিজেস করলেন কেন? বললাম, একটা মেয়েকে পছন্দ করি, তাকে পটাতে হবে, রোজ সকালে ভার্সিটিতে যাওয়ার সময় তার সাথে দেখা করতে হবে। আন্টি একটু অবাক হলো কিন্তু অনেক ভালোবাসে তো তাই মেনেও নিলো।

লোকটা অন্গরাল কথা বলেই যাচ্ছে আমি চায়ের কাপ হাতে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছি। লোকটা বড় অঙ্গুত। এতদিনে এতগুলো রিজেকশন মেনে নিয়ে এখনো পেছনে পড়ে আছে। ওহ তার পরিচয়টাই তো দেয়া হয় নি, উনার নাম শুন্দ, আমার ভার্সিটির একটা প্রোগ্রামে। তখন থেকেই লোকটা আমার পেছনে পড়ে আছে। সুন্দর পরিপাটি করে গুছিয়ে কথা বলে আমারও ভালোই লাগে তার সাথে কথা বলতে।

আমি একটু সময় তার দিকে তাকিয়ে ভাবছি একটা মানুষ কিভাবে এতো সহজেই সব বলে দিতে পারে। আমার ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে সে পুনরায় কথা বলতে শুরু করলো। সেদিনের পর থেকে ও বাসার সবাই জিজেস করে কতদূর এগোলো? আমি বলি একটুও না। কথাটা শুনে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। আমি কিন্তু এই এক বছরে একটুও হতাশ হইনি। শুন্দ এক নিঃশ্঵াসে কথাগুলো বলে থেমে গেলো। আমিও শুনলাম সবটা। তারপর দুজনেই চুপচাপ চা খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম। চা টা শেষ করেই শুন্দ বললো চলুন আপনাকে রিকশায় তুলে দেই। কিছু দূর এগিয়ে মোড় থেকে আমাকে রিকশায় তুলে দিয়ে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। উনার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে একবার বললেই উনি আমার পাশে এসে বসবেন। আমি হাতের ইশারায় তাকে ডাকলাম। উনিও দেরি না করে চুপ করে আমার পাশে এসে বসলেন। তার বাহুর সাথে আমার বাহু লেপ্টে আছে। প্রিয় মানুষটা প্রাক্তন হওয়ার পর এভাবে কারো সাথে এক রিকশায় বসিনি। বাসার সামনের মোড়ে আসতেই শুন্দ রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আচ্ছা আপনি এতো গুছিয়ে কথা বলেন কিভাবে? শুন্দ আজকে আপনার আমার সাথে সারারাত গল্প করতে ইচ্ছে করছে, তাই না?

আমি : কিভাবে বুঝলেন? শুন্দ : আপনি এর আগে একবার বলেছিলেন আমার সাথে মাঝে আপনার সারারাত বলে গল্প করতে ইচ্ছে করে। আমি : চলুন আরেকটু সামনে যাই। হাঁটতে হাঁটতে বাসার সামনে চলে এসেছি। এই মানুষটা আমাকে প্রেম নিবেদন না করলে হয়তো সারাজীবন বন্ধু বানিয়ে রেখে দিতাম। দেতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা আমাদের রেখছে। আমি আমার হাতটা শুন্দ'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম হাতটা ধরুন। শুন্দ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কী হলো, ধরুন। শুন্দ হাতটা ধরার পর তাকে বললাম, আজকে কথা দিয়ে যান আজকে গিয়েই মাথা থেকে এই ভালোবাসার ভূতটা বোঝে ফেলবেন। কালকে থেকে আমরা বন্ধুত্ব দিয়ে নতুন করে শুরু করব। আর যদি এমনটা না করতে পারেন তাহলে আর কখনো আপনার মুখ আমাকে দেখাবেন না। শুন্দ ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছিল এই যেন কেঁদে দিবে। শুধু বলেছিল ভালোবাসাটা বাদ দিতেই হবে? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। কথাটা শুনে সে চুপচাপ চলে গেল। পরের দিন সকালে চায়ের দোকানে গিয়ে দেখি শুন্দ নেই। চায়ের দোকানের পিচিটা বললো, আপা, ভাইজান আপনের লাইগ্যান একখানা চিঠি দিয়া গেছে। এই লন। জানেন আপা, আপনাদের মতো সুন্দর কইরা প্রেম করতে আমি কহনো কাউরে দেহি নাই। আপনাগো দুইজনরে একলগে মেলা সুন্দর মানায়। পিচিচি কথা শুনে একটু হেসে আমি চিঠিটা খুললাম-

প্রিয় মিলি,

আপনি আমাকে এতবড় শান্তি না দিলেও পারতেন। হয়তো একটু বিরক্ত করতাম সেটা ঘুরিয়ে এভাবে না বলে আপনি আমাকে সরাসরি বললেও পারতেন। আমি আপনাকে ভালোবাসাটা কখনোই ছাড়তে পারব না। তাই আর কখনো আমার মুখ আপনি দেখতে পাবেন না।

ইতি

শুন্দ

চিঠ্ঠিটা পরে কিছুক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিলাম। তারপর একটা রিকশা নিয়ে বাসায় চলে আসলাম। বাসায় এসে চুপচাপ বাথরুমে চলে গেলাম। কাউকে কিছু বলতে পারছিলাম না। ভেতরে ভেতরে সব দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিলো। গোসল শেষ করে আসার পর থেকেই গায়ে ভীষণ জ্বর। টানা সাতদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থেকে যখন একটু জ্বর কমেছে আমি আর দেরি না করে বেড়িয়ে চলে গেলাম চায়ের দোকানে। গিয়ে পিচ্ছির থেকে শুনলাম শুভ সেদিনের পর থেকে আর আসেনি। এভাবেই পুরো তিনটা মাস কেটে যায়। এদিকে আমি শুভকে খুঁজে পাগল প্রায়। শুভকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে চায়ের দোকানের পিচ্ছিটাকে একটা চিঠি হাতে দিয়ে বললাম এটা শুভ আসলে ওকে দিতে। শুনেছি ওর বন্ধু রোহান মাঝে মাঝেই এখানে আসে। তাই পিচ্ছিকে বললাম শুভকে না পেলে যেন রোহানের হাত দিয়ে হলেও চিঠ্ঠিটা শুভকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তিনদিন পর রাত্তায় পিচ্ছিটা আমাকে দেখেই ডাক দিয়ে সামনে এসেই কান্না করে দিল। আমি ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে। রোহন এসেছিলো সে চিঠ্ঠিটা পড়ে পিচ্ছিকে বলেছে সেদিন চিঠ্ঠিটা দিয়ে বাসায় যাওয়ার পথে একটি ট্রাকের চাপায় শুভ মারা যায়। কথাটা শুনে কোনোরকমে নিজেকে সামলেছিলাম তখন। ভাবতেও পারিনি লোকটাকে সত্যিই আর কখনো দেখতে পাবো না। জানলে হয়তো সেদিনই বলে দিতাম আমি তার সাথে আমার সারাজীবন পার করতে চাই। তারপর থেকে রোজ একটা করে চিঠি লিখি আর একটা বক্সে রেখে দেই। আজ এতগুলো বছর পরেও মনে হয় পাগলটা একটু পরেই এসে বলবে মিলি তুমি কি আমার বর্ষণ সঙ্গনী হবে?

লেখক : বাংলা বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১





অপেক্ষা

মো. ফরহাদ হোসেন

আজই সকালে দেখি আমার চোখে রোদের মিষ্টি আলোর ছটা সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর যেন ডেকে বলছে ঘূম থেকে ওঠো, দেখো প্রিয়তমা মেসেজ দিয়েছে। তার কথায় সাড়া দিয়ে দেখি অন্যমনক্ষ ফোনটায় কোন মেসেজ আসেনি। তখন মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, হয়তো প্রিয়তমাটি আজকে এই রাতের আকাশে ওঠা চাঁদের মায়ায় পড়ে রয়েছে তাই সূর্যের আলো তার কাছে পৌঁছায়নি। তখন মনকে মায়াভরা কঠে বললাম, অপেক্ষা করো।

এরপর যখন দেখি সকালটা ধীরে ধীরে রোদের আলোয় হারিয়ে যাচ্ছে, তখন মনের ছেট্টি কোণে একটু ভয় ঢুকলো। এসময় অবুবা মনটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম অপেক্ষা করো, হয়তো বিকেল বেলার দখিনা হাওয়া তার ডানায় করে প্রিয়তমার খবর নিয়ে আসবে।

এরপর যখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে এলো, তখন বিকেলটা যেনে কুকুরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলছে, আমি পারিনি আপনার প্রিয়তমাটির খবর নিয়ে আসতে, আমায় ক্ষমা করুন। তখন রেংগে গিয়ে তাকে বললাম, এজন্যই তো তোমাকে সবাই ক্লান্ত বিকেল বলে। এবার ভীত মনটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সে তো ক্লান্ত! সে খবর নিয়ে আসবে কিভাবে? তখন মন থেকে আধো আধো কঠে আওয়াজ এলো হৃষ ঠিকই তো, তুমি বরং গোধূলির চাঁদের জন্য অপেক্ষা করো।

যখন ক্লান্ত বিকেল বেলার সৃষ্টি নিমিষেই তন্দুর আড়ালে লুকিয়ে গেলো, তখন গোধূলির আগমন হলো কিন্তু চাঁদ উঠলো না। কথা ছিলো গোধূলি রাতের চাঁদের আলো প্রিয়তমাটির খবর নিয়ে আসবে, কিন্তু সে আসলো না। এরপর মনটা আরো বেশি সংকোচে পড়ে গেলো আর কাঁদতে শুরু করলো। তখন কানারাত মনটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম কাঁদিসনে, হয়তো রাতের আকাশের মেঘগুলো চাঁদের সাথে খেলা করছে, তাইতো চাঁদের আলো তাদের প্রাচীর ভেদ করে আসতে পারছে না। তখন মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, অপেক্ষা করো এই নিকষ্টকালো রাতের জন্য, জোনাকি পোকার দল জুলজুল করে এসে প্রিয়তমাটির খবর দিয়ে যাবে।

এরপর অপেক্ষা করতে থাকলাম জোনাকি পোকার দলের জন্য, কিন্তু তারা এলো না। তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রচণ্ড মেঘ ডাকছে আর বাড়ো হাওয়া বইছে। তবুও মন কিছু বুঝতে পারেনি, তার কারণ মনের ভেতরে এর চেয়েও বেশি মেঘের গর্জন ও বাড়ো হাওয়া বইছিলো প্রিয়তমার চিন্তায়।

এরপর মনকে আর অপেক্ষা করার কথা বলতে পারলাম না। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় হঠাতে করেই ঘনকালো মেঘ থেকে অরোরে বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। তখন বৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই বললাম, কেনো এসেছো তোমরা?

তখন বৃষ্টি পাহাড় সমান কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে আমায় বললো, আমরা তোমার প্রিয়তমা হারানোর শোকে কাঁদছি, যাকে তুমি এতো গভীরভাবে ভালোবাসো তার জন্য কাঁদছো, যার জন্য তুমি আজ সারাটাদিন অপেক্ষা করেছো তার জন্য কাঁদছি। কারণ সে আর এই প্রথিবীতে নেই।

এ কথা শোনার পর আমার চোখ থেকে বর্ণার ধারার মতো পানি ঝরতে থাকলো মনটা কাঁদেনি। কেনো জানেন? কারণ আমার মনটা তখন শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলো। তবে মরে যাওয়ার আগে মনটা শুধু একটা কথাই বলেছিলো, আর অপেক্ষা করতে হবে না তোমায়।

লেখক : অনার্স ১ম বর্ষ, রসায়ন, শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২



আনন্দ



প্রফেসর সুব্রত নন্দি

অধ্যক্ষ

সরকারি সাধা কলেজ

করাচিয়া, টাঙ্গাইল



শিক্ষক পরিষদ (২০২১-২০২২) এর সম্পাদক মো. মোশারফ হোসেন (মাঝে)
যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ আকতার হোসেন (ডানে)
ও কোষাধ্যক্ষ শামসুন্দর চৌধুরী (বাঁয়ে)।



শিক্ষকবৃন্দ, বাংলা বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, ইংরেজি বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, ইতিহাস বিভাগ



শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, অর্থনীতি বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, রাষ্ট্রীয়বিজ্ঞান বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, দর্শন বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, সমাজকর্ম বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, ইসলামি শিক্ষা বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, পদাৰ্থবিজ্ঞান বিভাগ



শিক্ষক, প্রদর্শক ও কর্মচারীবৃন্দ, রসায়ন বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, গণিত বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



শিক্ষকবৃন্দ, ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগ



শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, মার্কেটিং বিভাগ



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে কর্মরত শিক্ষক



সহকারী ঘাটাগারিক-কাম-ক্যাটালগারের সাথে কর্মচারীবৃন্দ



শারীরিক শিক্ষা বিভাগে কর্মরত শিক্ষক



প্রধান সহকারী ও অফিস সহকারীসহ কর্মচারীবৃন্দ



মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিরুল হাসান চৌধুরী নওফেল এম.পি. মহোদয়ের নিকট থেকে বাণী সংগ্রহ।



টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মোঃ ছানোয়ার হোসেনের নিকট থেকে বাণী সংগ্রহ।



টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ফজলুর রহমান খান ফারক্ক মহোদয়ের নিকট থেকে বাণি সংগ্রহ।



টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. জোয়াহেরুল ইসলাম (ভি.পি. জোয়াহের) এমপি
মহোদয়ের নিকট থেকে বাণি সংগ্রহ।



প্রাক্তন শিক্ষক পরিষদকে ফুল দিয়ে বিদায়ি সন্মানণ জানাচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সুব্রত নন্দী।



নবনির্বাচিত শিক্ষক পরিষদকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সুব্রত নন্দী।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর
মৃদুল চন্দ্র পোদার এবং
শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ২০২২
এর একুশে ফেব্রুয়ারির
প্রভাতক্ষেত্রে অংশগ্রহণ।





মহান বিজয় দিবস ২০২২
 উদ্ঘাপন উপলক্ষে
 আয়োজিত আলোচনা ও
 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ
 প্রফেসর সুব্রত নন্দী ও
 অতিথিবৃন্দ।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকীতে কেক
কাটছেন অধ্যক্ষ,
শিক্ষক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ।



মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদ
বেদিতে কলেজ পরিবারের পক্ষ
থেকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন।

জাতীয় শোক দিবসে
বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে
পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন
করছেন অধ্যক্ষ
মহাদয় এবং
ছাত্রনেতৃবৃন্দ।





অভ্যর্থনীণ ক্রীড়া
প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান
ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা
অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়
উপাচার্য প্রফেসর ড. মো.
মশিউর রহমান-এর সরকারি
সাদত কলেজে আগমন।



শেখ রাসেল দিবসে
দেয়ালিকা উন্মোচন।





বাষ্পিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক
প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের
অংশগ্রহণ।



বাষ্পিক
সাহিত্য-সাংস্কৃতিক
প্রতিযোগিতায়
বিজয়ীদের হাতে
পুরস্কার প্রদান করছেন
অতিথিবৃন্দ।



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়
দিবসের আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ
মহোদয় এবং শিক্ষকবৃন্দ।





মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়
দিবসের আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ
মহোদয় এবং শিক্ষকবৃন্দ।





সদ্য যোগদানকৃত অধ্যক্ষ প্রফেসর
সুব্রদ নন্দীকে বরণ করে নিচ্ছে
কলেজের ছাত্রনেতৃবৃন্দ।





কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়
কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
অনুষ্ঠান।



বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত
বর্ষাযাপন অনুষ্ঠান।



জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী
কলেজের জারি গানের দল।





সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ ২০২২
এর পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের
প্রধান অতিথি টিআইল জেলা
আওয়ামী লীগের সভাপতি ও
জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একুশে
পদকপ্রাপ্ত জনাব ফজলুর রহমান
থান ফারককে ফুলেল শুভেচ্ছা
প্রদান।



সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ ২০২২
এর পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে
অতিথিবৃন্দ।



সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ ২০২২
এর পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে
বক্তব্য বাখেন টিআইল-৫
(সদর) আসনের মাননীয় সংসদ
সদস্য আলহাজ মো. ছানোয়ার
হোসেন।





সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ ২০২২
এর পুরষ্ঠার প্রদান অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য
রাখেন টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী
লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ
চেয়ারম্যান জনাব ফজলুর
রহমান খান।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ ২০২২
এর পুরষ্ঠার প্রদান অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইল জেলা
আওয়ামী লীগের সাধারণ
সম্পাদক ও বাসাইল-সখিপুর
আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য
এডভোকেটি জোয়াহেরুল ইসলাম
(ডি.পি. জোয়াহের)।



সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ ২০২২
এর পুরষ্ঠার প্রদান অনুষ্ঠানের
উপস্থাপকবৃন্দ।



কলেজের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
‘বাঁধন’ এর উদ্যোগে
রক্তের গ্রন্থি নির্ণয়।



স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘বাঁধন’ এর
রজতজয়ন্তি অনুষ্ঠান।



সরকারি সা'দত কলেজের বিএনসিসি'র কার্যক্রম



সরকারি সাদত কলেজের রোভার ফ্লাউট-এর কার্যক্রম





কলেজের অঙ্গনৰীণ ক্রিড়া
প্রতিযোগিতার উদ্বোধন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের
আন্তঃকলেজ ক্রিড়া প্রতিযোগিতায়
সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের
সাথে ক্রিড়া শিক্ষক।



হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের সমাধিতে
কলেজ পরিবারের পুস্পার্য
নিবেদন।

শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত
‘সাগরকন্যা’ কুয়াকাটায়
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।



শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত
আনন্দ ভ্রমণে ‘সাগরকন্যা’
কুয়াকাটার ঝাউবনে ফটোশেন।



সরকারি সাধত কলেজের
ওয়াজেদ আলী খান পাল্লী হলের
মূল ভবন।





কলেজের সনাতনধর্মী
শিক্ষার্থীদের জন্য ইব্রাহীম খাঁ
ছাত্রাবাস।

সরকারি সাধত কলেজের
ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রিনিবাস।



সরকারি সাধত কলেজের
কলা ভবন।



সরকারি সাধত কলেজের
বাণিজ্য ভবন।

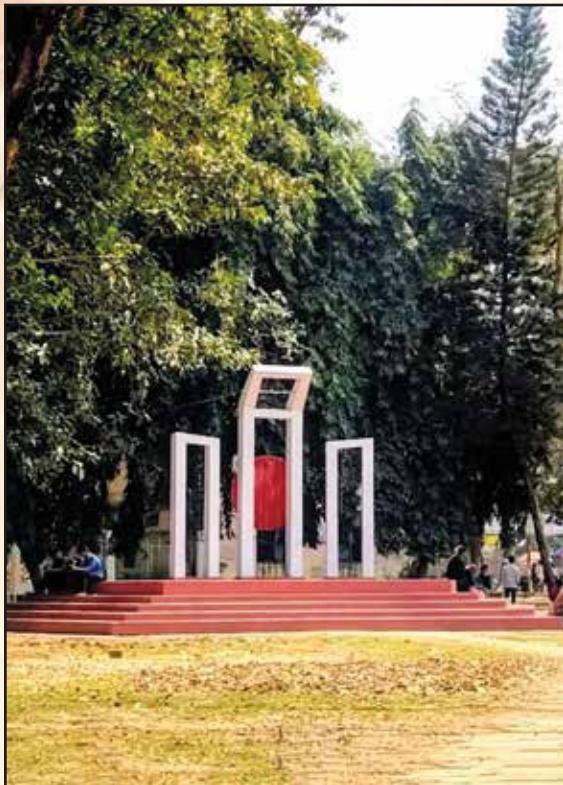


সরকারি সাধত কলেজের
কেন্দ্রীয় মসজিদ।



সরকারি সাধত কলেজ গ্রন্থাগারে
পাঠে নিবিষ্ট শিক্ষার্থীরা।

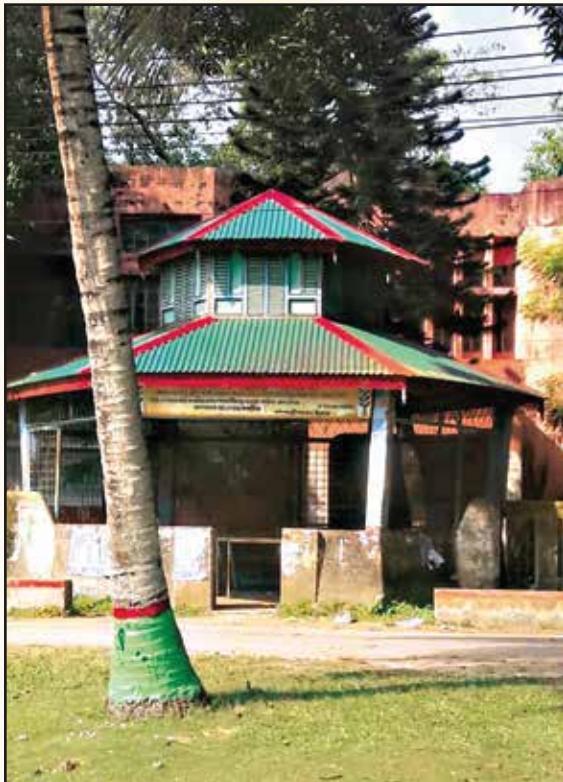




কলেজে শহিদ মিনার।



কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ প্রিসিপাল ইব্রাহিম খাঁ'র
ব্যবহৃত চেয়ার।



জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত কুটির।



কলেজের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথি।

